বিদেশী

ভারত সাধক ।।

বিদেশী ভারত সাধক

সোমেন্দ্রনাথ বসু

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন।
কলকাতা—৬।

১নং শংকর ঘোষ লেন।
কলকাতা—৬।

সূচীপত্র

॥ বিদেশী ভারত সাধক ॥

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রদ্ধাভাজনেষু

......The Hindu has to acknowledge an immense debt to European Scholars. The researches of European Scholars have converted what was once unintelligible nonsense to a subject of accurate scientific study. What was hitherto unnecessary and meaningless, has now been shown to be a necessary condition of primitive culture and full of deep signification. A myth can now be traced back from its ulterior development to its origin.

—**Bankim Chandra Chattopadhaya**

(Letter IV : Letters on Hinduism)

নিবেদন

সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের সংকীর্ণতার মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে আমরা ভুলেছিলুম। অষ্টাদশ শতাব্দী সেই বিস্মরণের কাল। ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যজগতের বিবিধ বিষয় নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া শুরু করলেন এবং সমস্ত জগতের দৃষ্টি ঐদিকে আকর্ষণ করলেন তাঁরা সকলেই বিদেশী। তাঁদেরই পরিশ্রমে, যত্নে ঐকান্তিক সাধনায় ভারতীয় মহাকাব্য, নাটক, জ্যোতিষ, আইন প্রভৃতির চর্চা নতুন করে শুরু হলো। ভগবদগীতা, বেদ, কোরাণ কোনকিছুই তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো না। তাঁরা আশ্চর্য হলেন, চমৎকৃত হলেন সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য দেখে। কেউ কেউ স্পষ্ট বল্লেন যে গ্রীক ল্যাটিনের চেয়েও এ ভাষা অনেক উন্নত অনেক সমৃদ্ধ।

যে কজনের কথা এই গ্রন্থে আছে তাঁদের মধ্যে মণিয়ার উইলিয়ামস, আলেকজাণ্ডার সোমা আর ফেলিক্স কেরীকে বাদ দিলে সকলেই হয় সরকারী কর্মোপলক্ষ্যে নয় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন এদেশে। ফেলিক্স কেরী যখন আসেন তখন তিনি বালকমাত্র। আলেকজাণ্ডার সোমা বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্য নিয়েই আসেন। জোন্স ও মণিয়র উইলিয়মস যখন আসেন তখনই তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের খ্যাতি অর্জন করেছেন স্বদেশে। কোলব্রুক, উইলকিন্স, প্রিন্সেপ সাধারণভাবে চাকরী করতেই এসেছিলেন। কোলব্রুক তো বেশ কিছুকাল প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সুযোগ সত্বেও এ পথ এড়িয়ে চলেছেন।

ফেলিক্স কেরী ও মণিয়ার উইলিয়মস ছাড়া এঁরা সকলেই এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কোন না কোন ভাবে। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম জোন্স ভারত ও প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার যে

কেন্দ্র গড়ে তুললেন তার বৃত্ত ক্রমবর্ধমান। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে জাগরণের ঢেউ উঠলো তার সূচনায় এঁদের সাধনা নেই এমন কথা কে বলবে। আজ প্রায় দুশতাব্দী হতে চললো —আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব কি অবস্থার মধ্যে তাঁরা কাজ করেছেন—কি ভাবে পথ কেটেছেন।

পরিশিষ্টে এঁদের কারো কারো নিজেদের লেখা বা চিঠিপত্র থেকে একটি করে অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো—তাতে এঁদের বুঝতে সুবিধা হবে।

এই গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে দুটি লোককে মনে পড়ছে যাদের অকুণ্ঠ উৎসাহ আর তাগাদা ছিল এই লেখার পিছনে—একজন 'সমকালীনে'র আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত আর একজন অনুজতুল্য শিবলাল বর্ধন। ফেলিক্স কেরী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে আমায় সাহায্য করেছেন মঞ্জুলা বসু—মণিয়ার উইলিয়ামস রচনাটি অনেকাংশে তাঁরই। আমার এই লেখা প্রকাশে তাঁর আনন্দিত হবার কারণ আছে।

এ গ্রন্থ পাঠক সমাজে কতটা আদৃত হবে জানিনা। তবু বুকল্যাণ্ডের জানকীনাথ বসু প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন—তিনি সাহিত্যরসিক—নূতন বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশকালে সব সময়ে বাজারের কথা ভেবে চালিত হন না। সেইটুকুই আমার ভরসা।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

উইলিয়াম জোন্স

উন্নত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উইলিয়াম জোন্স—তাঁর পিতার নামও উইলিয়াম জোন্স। প্রথম উইলিয়াম জোন্স চাষীর ঘরের ছেলে হলেও অঙ্কে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সেই ক্ষমতাই নিউটন হ্যালি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের প্রশংসা এনে দিয়েছিল তাঁকে। তাঁর বেশ পরিণত বয়সেই পুত্র উইলিয়াম জোন্সের জন্ম হলো। বছর তিনেক পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী মেরিয়া ছোট শিশুটিকে নিয়ে একলা হয়ে পড়লেন কিন্তু মনের বল ও সাহস হারালেন না।

বালক উইলিয়াম মাতৃভাগ্যে গর্ববোধ করতে পারতো। গণিতবেত্তা স্বামীর কাছে তার মা দিনের পর দিন এলজেব্রা, ট্রিগোনোমেট্রি আর নৌবাহনের গাণিতিক তত্ত্ব শিখেছিলেন। তাতে তাঁর বুদ্ধির স্বচ্ছতা এলো, বুদ্ধি ও অনুভূতির ভারসাম্য স্বভাবকে সুন্দর করলো। মহৎ পুত্র গড়ে তুলতে মহীয়সী মাতার প্রায় সকল গুণই তাঁর ছিল। মাতৃচ্ছায়ায় লালিত শিশু চার বছর বয়সে পড়তে শিখলো। কিন্তু বহু যত্নেও উইলিয়ামের স্বাস্থ্য অটুট রইলো না। সাত বছর বয়সে হ্যারোতে তাঁকে পড়তে পাঠানো হলো। প্রথম কয়েক বছর শরীরের উপর নানা ধাক্কা এলো, বিশেষ কিছু পড়াশুনা এগুলো না। বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন সকলে আবিষ্কার করলো যে ঐ ছোট ছেলেটিকে যত নির্বোধ বলে মনে করা হয়েছিল সে আদৌ তত অবহেলার পাত্র নয়। সেক্সপীয়রের সমগ্র টেম্পেস্ট তার কণ্ঠস্থ, প্রাচীন সাহিত্যের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য তার নখাগ্রে—প্রচুর পরিমাণে সে কবিতা লেখে লোক চক্ষের অগোচরে—যার অতি

অন্নই বালকের খেয়াল খুসীর মর্জি পেরিয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে।

১৭৬৩ সালে হ্যারোয় থাকতে থাকতেই জোন্স তাঁর কবিতাগুলির একটি সংকলন করে তাঁর বন্ধু জন পার্ণেলের কাছে দিয়েছিলেন। জন পার্ণেল বন্ধুর প্রতি ভালবাসাতেই হোক বা তাঁর দূরদৃষ্টির ফলেই হোক বন্ধুর রচনাগুলি ভাবীকালের জন্য সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। দাবা খেলা জোন্সের খুব প্রিয় ছিল। তিনি দাবার উৎপত্তি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত কাব্য ঐ বছরেই লিখলেন—তার নাম কাইসা।

ক্রমে ক্রমে জোন্সের বহুমুখী বৃত্তির প্রকাশ দেখা গেল। হ্যারোতে তিনি ইতিমধ্যেই কিছু কিছু হিব্রু শিখেছেন। ১৭৬৪ সালে তিনি অক্সফোর্ডে এসে আরবি ও পারসী শিখতে সুরু করলেন—নিজের ব্যয়ে লণ্ডন থেকে অক্সফোর্ডে এক আরববাসীকে নিয়ে এলেন তাঁর কাছে পড়বার জন্য। তরোয়াল চালনায় যে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল তাকে ঝালিয়ে নিয়ে তরোয়ালচালনা শিখতে লাগলেন আর সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইতালীয়, স্প্যানীয়, পর্তুগীজ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে যাতায়াত শুরু করলেন।

১৭৬৬ সালে জোন্স উপার্জনের পথ পেলেন গৃহশিক্ষকতায়—আর্ল স্পেন্সারের পুত্র পরবর্তীকালের লর্ড আলথ্রোপ তাঁর ছাত্র হলেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে ভবিষ্যৎজীবনে যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তার ফলে উভয়ের পত্রাবলী জোন্সের কাজ ও চরিত্রসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। ট্রেজারীতে সরকারী দোভাষীর কাজ করার জন্য ডিউক অফ গ্রাফটন তাঁকে যে আমন্ত্রণ জানালেন তা তিনি গ্রহণ করলেন না। এই বছরেই তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হলো আনা মারিয়া শিপলের সঙ্গে ;—দীর্ঘকাল পরে আনা তাঁর সহধর্মিনী হয়েছিলেন।

স্পেন্সার পরিবারের সঙ্গে পরের বছর দেশভ্রমণে বেরুলেন জোন্স। স্পা'তে থাকবার সময় জারমান ভাষাকে ভাল করে দখল করার

চেষ্টা করলেন। স্পেন্সার পরিবারের বিরাট লাইব্রেরীর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রেয়সী এলো চীনা ভাষা। এই সময়ে ডেনমার্কের রাজা সপ্তম খৃষ্টীয়ান নাদিরশাহর একটি ইতিহাস ফরাসীভাষায় অনুবাদ করার জন্য জোন্সের কাছে আমন্ত্রণ পাঠালেন। যথার্থ পাণ্ডিত্যের কৌলীন্য ছিল বলেই স্বাভাবিক নম্রতা ও বিনয় জোন্সের চিরদিন ছিল। তখন আলেকজাণ্ডার ডো ফেরিস্তার অনুবাদ সদ্য প্রকাশ করেছেন। জোন্স তাঁর নাম পাঠালেন। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি তাঁর যে কোন বিশেষ লুব্ধতা ছিল না এ ঘটনা তাই প্রমাণ করছে। অবশ্য আলেকজাণ্ডার ডো শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন না। ইতিহাস অনুবাদের এই অপ্রিয় কাজ যদিও ঘাড়ে নেবার একটুও ইচ্ছা ছিল না তবু শেষ পর্যন্ত যখন নিতে হলো তখন অত্যন্ত যত্ন ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাজ তিনি করলেন। ফরাসীভাষায় তাঁর দক্ষতা তো প্রমাণিত হলোই, ফরাসী বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর কাছে তাঁর পাণ্ডিত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শোনা গেল। ১৭৬৯ সালে স্পেন্সার পরিবারের কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থাতেই তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে বাস করতে লাগলেন ফরাসী ভাষার উপর তাঁর অধিকার সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। ষোড়শ লুই যখন জোন্সের সম্পূর্ণ পরিচয় পেলেন তখন অবাক বিস্ময়ে বলেছিলেন 'কি আশ্চর্য ক্ষমতা এই লোকটির—আমাদের দেশের ভাষা আমার চেয়ে ভাল করে বোঝে।'

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জোন্স দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে ফিরে এলেন ইংলণ্ডে। স্পেন্সার পরিবারের শিক্ষকতা ছেড়ে আইন পড়তে শুরু করলেন।

পরের বছর পারসী ভাষার ব্যাকরণ তিনি প্রকাশ করলেন। সেই ব্যাকরণ সুদীর্ঘকাল পরবর্তী শিক্ষানবীশদের আশ্রয়স্থল ছিল। ১৭৭২ সালে তাঁর এসীয় ভাষাগুলির কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ইংলণ্ডের সুধীমণ্ডলীর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় রইলোনা যে জোন্সই

সেখানে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রথম পথিক। ১৭৭৩ সালে স্যামুয়েল জনসনের ক্লাবের তিনি সভ্য হলেন। নিকট সংস্পর্শ লাভ করলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ ইংরাজদের। তাঁর বন্ধু হলেন বার্ক, শেরিডন, গ্যারিক, গিবন, জোশুয়া রেনল্ডস্ এবং স্বয়ং জনসন। জনসন জোন্সের পারসী-ব্যাকরণ হেস্টিংসকে উপহার পাঠিয়ে লিখেছিলেন "That literature is not totally forsaking us and that your favourite language is not neglected will appear from the book." ১৭৭৪ সালে তাঁর "কমেণ্টরিস অন এসিয়াটিক পোয়েট্রি" ল্যাটিনে ছ' ভল্যুমে প্রকাশিত হলো। এই সময় তিনি মনে মনে রাজনৈতিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন এবং বোধহয় সেইজন্যেই লিখেছিলেন—ছায়াঘন শান্তির দিন শেষ করে ধূলিধূসরিত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমার ডাক এসেছে—"Long enough methinks I have practised in the shade ; now I am summoned to the dust and the battle front."

রাজনীতির প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল। জোনাথন শিপলে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি বন্ধুদের সঙ্গ তাঁকে গভীর ভাবে রাজনীতির আবর্তে টেনে নিয়ে গেল। তখন আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম ইংলণ্ডের রাজনৈতিকদের বিচলিত করছিল। তিনি তখনকার একটি চিঠিতে লিখছেন—"Did you know the Americans had flourishing settlements seven hundred miles from the coast ? Every man among them is a soldier, a patriot—Subdue such a people ? The king may as easily conquer the moon or wear it in his sleeve." আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি তীব্র সমর্থক ছিলেন। তৃতীয় জর্জের স্বৈরাচারী ব্যবহারেরও কঠিন সমালোচনা করতে তিনি ছাড়েন নি। আইন ব্যবসায়ে তাঁর পসার বাড়তে লাগলো।

এই সময়ে ভারতবর্ষে একটি বিচারকের পদ খালি হলো। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ জোন্স স্বভাবতঃই এই কাজটি পেতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট ভাষণে তিনি উচ্চতর রাজপুরুষদের যে সব সময়ে খুসী করতে পেরেছেন তা নয়। তিনি নিজেও জানতেন যে উপরের মহলে তাঁর বন্ধু যত শত্রুও তত। ভারতবর্ষের চাকরিটা না হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল, সেই কথা স্মরণ করে এক বন্ধুকে তিনি লিখলেন—"But be assured my dear lord that if the minister be offended at the style in which I have spoken, do speak and will speak of public affairs and on that account should refuse to give me the judgeship, I shall not be at all mortified." যত সহজে কাজ হওয়া উচিত ছিল তত সহজে হলো না। দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগলো কাজ পেতে। ইতিমধ্যে জোন্সের রাজনৈতিক মতামত উগ্র হতে লাগলো। ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় নিজের মত বললেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, বার্ক শিপলে প্রভৃতির সঙ্গে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর স্বাধীন-চিন্তার পরিচয় এই সময়ে তাঁর দাসপ্রথার বিরুদ্ধতায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে পাওয়া গেল।

ইতিমধ্যে আনা মারিয়া শিপলের সঙ্গে জোন্সের ঘনিষ্ঠতা বেশ জমে উঠেছে। মনে আশঙ্কা ছিল জোন্সের, হয়তো আনার মন ইতিমধ্যেই অন্য কোথাও বাঁধা পড়েছে। তবু একদিন ভরসা করে নিজের কথাটা বলে ফেল্লেন। যা ছিল প্রত্যাশা অথচ যার কোন ভরসা ছিল না তাই ঘটলো। আনা মারিয়া শিপলে জোন্সের সঙ্গে প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হলেন। একটি চিঠিতে লিখছেন "that heart which I had the joy to find disengaged, I have had the happiness (and have I not reason to be vain?) of winning in

exchange for my own ; and, having obtained the consent of my venerable friend and the concurrence of her amiable family, have nothing for the present to desire, but the approbation of those common friends."

৪ঠা মার্চ ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জোন্সের ভারতবর্ষের চাকরীর কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলো। স্যার উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হলো। ৮ই এপ্রিল আনার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলো। ১২ই এপ্রিল স্যার উইলিয়ম জোন্স ও লেডী জোন্স ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে জোন্স ভারতবর্ষে এসে পৌছলেন। স্যার ইলাইজা ইম্পে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে জাহাজ ঘাটে গেলেন। কে জানত সেদিন যে বিচারকের কাজ নিয়ে যিনি এলেন তাঁরই হাতে ভারতবর্ষের প্রাচ্যবিদ্যাগবেষণার শ্রেষ্ঠতম পীঠস্থান ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। ভারতবর্ষে মাত্র এগার বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এই এগার বছরে ভারতবর্ষের কাব্যশাস্ত্র, দর্শন, আইন-কাহ্নন, ভাষা আয়ত্ত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা তিনি করেছেন। প্রাচ্যবিদ্যার গৌরব তাঁরই সাধনায় পাশ্চাত্যে গিয়ে পৌচেছিল। তাঁর প্রধানতম কীর্তি এসিয়াটিক সোসাইটি আজও তাঁর সাধনার সাক্ষ্য বহন করছে। তখন কি কেউ ভাবতেও পেরেছিল যে ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডের বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ফিরে যেতে তিনি আর পারবেন না।

কলকাতায় পৌছেই নিজের সরকারী কাজে লেগে গেলেন জোন্স। কিন্তু শুধু চাকরী করতেই তো তিনি আসেন নি—বিরাট ভারতবর্ষ, বিরাটতর এসিয়া তাঁর মনের মধ্যে যে স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিল তারই টানে অন্য কাজে হাত লাগালেন তিনি। লণ্ডন রয়াল সোসাইটির অনুরূপ এসিয়াটিক সোসাইটি গড়ে তোলার জন্য জোন্স কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে

প্রথম সভা আহ্বান করলেন। তিনি ভারতে আসবার আগেই তাঁর সুনাম ভারতে এসে পৌঁচেছিল। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর তখন তাঁর বয়স। কর্মক্ষমতার পূর্ণতায় তিনি প্রাণবন্ত। নিজে একা একা কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝলেন যে এই বিরাট কাজ কোন লোকের পক্ষে একা করা সম্ভব নয়। বহু ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা উদ্বুদ্ধ করার জন্যই তিনি ঐ সভা ডাকেন। ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তাঁকেই ঐ সভার সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করা হলো। কিন্তু হেস্টিংস তাঁর সমস্ত সহানুভূতি সত্ত্বেও নিজেকে এর সঙ্গে জড়িত না করে জোন্সের উপরেই ঐ দায়িত্ব দিতে চাইলেন। জোন্সের জীবনীকার লর্ড টেনমাউথ বলছেন যে হেষ্টিংস "begged leave to resign his pretensions to the gentleman, whose genius had planned the institution and was most capable of conducting it, to the attainment of the great and splendid purpose of its formation." এগার বছর জোন্স এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। সেই সভা যে প্রায় পৌনে দুশো বছর বেঁচে রইলো এবং ভারতবর্ষে প্রাচ্যবিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হয়ে রইলো তার মূলে ছিল সেই মহান দ্রষ্টার সাধনা।

সোসাইটির প্রথম সভ্যদের মধ্যে মিঃ উইলিয়াম চেম্বার্সের পার্সী ও আরবী সাহিত্যে অধিকার সুদৃঢ় ছিল, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন আকবরের আইন অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে খ্যাত হয়েছিলেন, ক্যাপ্টেন চার্লস হ্যামিল্টন মুসলমানী আইনকানুনের অনুবাদক ছিলেন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন চার্লস উইলকিন্স যিনি সংস্কৃতভাষায় প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন এবং বাংলা ও সংস্কৃত ছাপার অক্ষর আবিষ্কার করেছিলেন। এই জাতীয় লোকদের জুটিয়ে নিয়ে জোন্স কাজ শুরু করেন।

ভারতবর্ষে আসবার পর, নিজের মনের মত কাজে লাগবার অবকাশ যখন তিনি পেলেন তখনই কিন্তু মানুষটিকেও স্পষ্ট চেনবার সুযোগ হলো আমাদের। ভারতবর্ষকে তিনি ভালবেসেছিলেন। এই বিরাট দেশের ইতিহাস, ভাষা, আইন ও তার জীবনের বিচিত্রতা তাঁর ভাল লেগেছিল। তিনি স্পষ্ট বলেছেন "I never was happy till I was settled in India." কিন্তু একটি দুঃখের কারণ রইলো —লেডী জোন্স ভারতবর্ষের আবহাওয়া সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর শরীর ক্রমাগত অসুস্থ হতে লাগলো। কিন্তু স্বামীর কাজের জন্য সে অসুস্থতাকে হাসিমুখে সহ্য করার শক্তি তিনি যে রাখতেন তার বহু প্রমাণ আছে। জোন্সের কাছে সেটা আরও উদ্বেগের কারণ হতে লাগলো। সেই উদ্বেগের কথা নানা চিঠির বিষয়বস্তু হয়েছে, একটিতে বলছেন "I have often touched upon the expedience of her return to Europe...but she will not hear of leaving me, and her affectionate resolution only gives me keener pain, as I now believe firmly that she never can enjoy health in Bengal."

আর ছিল আশ্চর্য ভালবাসা সংস্কৃত ভাষার জন্য। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বিশ্বের দ্বারপ্রান্তে নতুন করে সংস্কৃতের বাণী আবার পৌঁছে দিলেন। যে অবজ্ঞা আর অনাদর সেদিন ইউরোপের উন্নাসিক বিদগ্ধ সমাজের কাছে সংস্কৃতকে অপাংক্তেয় করে রেখেছিল তা কাটিয়ে উঠতে তিনিই প্রথম কাজ শুরু করলেন। ছাত্রের মত একাগ্রতা নিয়ে তিনি সংস্কৃত শিখলেন। সংস্কৃতকে তিনি কতদূর শ্রদ্ধা করতেন তার প্রমাণ তাঁর কথাতেই রয়েছে "The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin and exquisitely refined than either." ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে তিনি বলছেন "I am tolerably strong in Sanskrit." একবছর পরে লিখছেন "I now converse familiarly in Sanskrit."

আর একটা মহত্ব প্রকাশ পেলো তাঁর স্বভাবের, সম্পূর্ণ অন্যভাবে। ভারতবর্ষকে জানতে হবে, অন্য সমস্ত বিদেশীর চেয়ে ভাল করে এটা তো ছিলই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। নিজে ছিলেন বিচারপতি, মানুষের অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তিবিধান করা ছিল তাঁর কাজ। কিন্তু একদল মানুষের প্রতি আইনত শাস্তি বিধান করলেও তাঁর ছিল অশেষ সহানুভূতি। যারা দেনা করে নিঃস্ব হয়ে গেছে—ইংরাজীতে যাকে বলে Insolvent Debtors—তাঁদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনা ছিল। ১৭৮৮ সালে তিনি যে লায়লা মজনু অনুবাদ করলেন তার ভূমিকায় লিখলেন "I think it necessary to declare, that the property of the whole impression belongs from this moment to the attorney for the poor in the Supreme Court, in trust for the miserable persons under execution for debt in the prison of Calcutta."

ভারতবর্ষের জীবনে তিনি গভীর শান্তি পেয়েছিলেন। সেদিনকার কলকাতা শহর আজকের মতো শব্দমুখর হয়ে ওঠেনি—নির্জনে বসে অনন্যমনে অধ্যয়নের অবকাশ সেদিন যথেষ্টই ছিল। কোর্টের কাজ শেষ করেও পড়াশুনা করার যথেষ্ট সময় তিনি করে নিতেন। ছুটির দিনে সারা সকাল শুধু সংস্কৃতই পড়েছেন। গঙ্গার তীরে অস্তোন্মুখ সূর্যের সৌন্দর্য উপভোগ করার মন ও অবসর দুইই ছিল। তাঞ্জামে চড়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতেন অ্যানা, পাশে পাশে যেতেন জোন্স। একটি চিঠিতে লিখেছেন "you will judge, therefore, whether I wish to change this calm course of life for the house of commons, from which I should return three or four nights, in seven with despair and the head-ache."

এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়েছে একথা তিনি কখনো মনে করেন নি। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই নানা লোকের কাছে আলোচনার নিত্যনূতন বিষয়ের সন্ধান করেছেন তিনি। ১৭৮৪ সালের মার্চ মাসে প্যাট্রিক রাসেলকে লিখছেন যে যদি তিনি সমুদ্রোপকূলে কোন জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পান তা উদ্ভিদবিদ্যারই হোক বা অন্য যে কোন বিষয়েরই হোক তা যেন জানাতে না ভোলেন। সেই চিঠিতেই বলছেন ভারতবর্ষ প্রত্যেকদিনই তাঁকে নিত্যনূতন বহু বিষয়ের সন্ধান দিচ্ছে। এবং "if I were to stay here half a century, I should be continually amused." কোচীন-চীনের বিবরণ পাঠানোর জন্যে আর একটি পত্রে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন চার্লস চ্যাপমানকে।

ইতিমধ্যে কাশী গয়া ঘুরে এসেছেন তিনি। সেখানে পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা বলায় দোভাষী ব্যবহার করতে হয় তাঁকে। সেটা ভালো লাগে নি। ১৮৮৫তে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে কৃষ্ণনগর গেলেন। মনে মনে অসীম আনন্দ অনুভব করলেন এই ভেবে যে প্রাচীন নদীয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়েছেন—সংস্কৃত তখন কিছু কিছু বলতে পারেন—স্বর্ণখনির দেখা পেয়ে মন মাতাল হয়েছে; বলছেন—সংস্কৃতের যে খনি আমার সামনে তা যদি খুঁড়ে ঐশ্বর্য আহরণ করতে না পারি তবে আমার অথর্ব থাকাই ভাল।

বাংলা দেশ ও মানুষের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ হয়তো জন্মেছিল। দেখা গেল কয়েক বছর পরেই তিনি ছুটছেন চট্টগ্রামে সেখানকার অবস্থা জানবার জন্য। সরকারী কাজে নয় সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়। সেখান থেকেও নতুন নতুন তত্ত্ব আহরণ করে নিজের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন প্রতিদিন।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জানাচ্ছেন যে নানা বিষয়ে সোসাইটির কাজ চলছে। স্যামুয়েল ডেভিডসন সূর্য সিদ্ধান্তের অনুবাদ করেছেন এবং

ভারতীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে নিত্যনূতন গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে আছেন—বারাণসীতে উইলফোর্ড ভৌগোলিক তত্ত্ব আলোচনায় ব্যাপৃত—গভীর আনন্দে তিনি জানাচ্ছেন—our Society still subsists. আজ দেড়শো বছর পার হয়ে গিয়েও সেদিনকার সেই শিশু সমিতি সতেজ ও জীবন্ত হয়ে আছে।

১৭৭৬ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে ভারতবর্ষের আইন দিয়েই ভারতবর্ষের শাসনকার্য চলা উচিত। ভারতবর্ষে তখন সংস্কৃত জানা কোন সাহেব নেই। তাই হেস্টিংস একদল পণ্ডিতকে ভার দিলেন সংস্কৃত থেকে পারসী ভাষায় ভাষান্তর করতে। তাহলে পারসী-জানা সাহেবরা সহজেই তার থেকে ইংরাজী করতে পারবে। এই সময়ে চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত শিখে ফেললেন। তিনিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি ভাল সংস্কৃত শিখেছিলেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেন তখনই মনুর নিয়মাবলীর বেশ খানিকটা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। সেই অনুবাদ এসে পড়লো জোন্সের হাতে। হিন্দু ও মুসলমান আইনের একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ সুশাসনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন মনে করে জোন্স ১৭৮৮ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে জানালেন যে একদল পণ্ডিতের সাহায্যে এখনি এ কাজে হাত দেওয়া উচিত—তিনি নিজেই পরিদর্শনের দায়িত্ব নিতে চাইলেন। কর্ণওয়ালিস সে দায়িত্ব তাঁকেই দিলেন। কিন্তু এ কাজের শেষ উইলিয়াম জোন্স দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে এ কাজ সম্পূর্ণ করলেন হেনরী টমাস কোলব্রুক।

শুধু সংস্কৃত নয় আরও এক নতুন প্রেয়সী তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলো। তিনি ইংলণ্ডে হেস্টিংসকে লিখছেন "my Principal amusement is Botany and the conversation of the Pundits, with whom I talk fluently in the language of the Gods."

তিনি তো শুধু পুঁথিপড়া পণ্ডিতই ছিলেন না, সদাজাগ্রত প্রাণ তাঁর দৃষ্টিকে দূরপ্রসারী করেছিল, তাই গাছপালা জীবজন্তু কোন কিছুই বাদ পড়েনি।

ভারতবর্ষের জীবনের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতার মধ্যে জোন্সের দিন পরিপূর্ণ আনন্দেই কাটছিলো। কেবল লেডী জোন্সের শারীরিক অসুস্থতা মাঝে মাঝে উদ্বেগের কারণ হচ্ছিল। জোন্সের অনেক অনুনয়বিনয়ের পর লেডী জোন্স ইংলণ্ডে ফিরে যেতে রাজী হলেন। ১৭৯৩ সালে প্রিন্সেস অ্যামেলিয়া জাহাজে ২০শে নভেম্বর লেডী জোন্স ফিরে গেলেন.। জোন্স কথা দিয়েছিলেন যে ১৭৯৫ সালে তিনি নিজেও ফিরে যাবেন।

ইতিমধ্যে আইনের কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজও তিনি করেছেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির 'রিসার্চেস' পত্রিকার সম্পাদকত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। সেই বছরেই প্রকাশ করলেন শকুন্তলা। জোন্সের অনুবাদিত শকুন্তলা পড়েই জার্মানীর মহাকবি গ্যেটে ভারতবর্ষকে জেনেছিলেন, পৃথিবীর কাছে কালিদাসকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। নিছক সাহিত্য অনুবাদের অবকাশ তাঁর বেশী হয়নি।

১৭৯৪ খৃঃ-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে on the Philosoply of the Asiaticks সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

ক্লান্ত হয়েছিল শরীর। অতিরিক্ত বিদ্যাচর্চায় অবসন্ন হয়েছিল মন। অক্ষয় প্রেরণার অফুরন্ত উৎস লেডী জোন্স কাছে নেই। ১৭৯৩ সালের ৯ই অক্টোবর লিখছেন "This day my dear lord, I am completely forty seven years old." কিন্তু যে ক্ষত ভিতরে ভিতরে গভীর হয়েছে তা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়লো। ২০শে এপ্রিল ১৭৯৪, সন্ধ্যার শরীরের অসুস্থতা লক্ষ্য করলেন—২৭শে এপ্রিল সব শেষ হয়ে গেল। লর্ড টেইনমাউথ তাঁর মৃত্যু বর্ণনায় বলছেন "He was lying on his bed in a posture of meditation ; and the

only symptom of remaining life was a small degree of motion in the heart, which after a few seconds ceased and he expired without a pang of groan." লেডী জোন্সকে আশ্বাস দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে কয়েকদিন পরেই ফিরবেন। সে আশ্বাস সত্য হলো না। তিনি নিজেও ভাবেন নি এমন করে এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসবে। শেষের দিনগুলি মিডলসেক্সের গ্রামাঞ্চলে কাটাবেন এমনি একটা বাসনা ছিল মনে মনে—চিঠিতে তা প্রকাশও করেছেন। বহু পুঁথিপত্র যোগাড় করেছিলেন—এক বন্ধুকে একটি বাক্স বোঝাই করে সব পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে লিখলেন "I shall send a box of inestimable manuscripts, Sanskrit and Arabic to your friendly care. If I return to England, you will restore them to me; if I die in my voyage to China or through my journey to Persia you will dispose of them as you please."

ফোর্ট উইলিয়মের প্রাঙ্গণ থেকে মুহুর্মুহুঃ কামান গর্জন শোনা গেল, সমরবাহিনীর ব্যাণ্ডে করুণ একটি সুর বাজলো, উজ্জ্বল প্রভাত ভরে গেলো বিষণ্ণতায়। একটি নীরব শোভাযাত্রা চললো শবাধারের পিছন পিছন। যে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর অধীনে কাজ করতো উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তারা ভেঙ্গে পড়লো। এ সবই পুরোনো কাগজপত্রে লেখা আছে। কিন্তু কেউ লিখে রাখে নি, এ খবর কেমন করে পৌঁচেছিল লেডী জোন্সের কাছে। তাঁর কবরে কি লেখা থাকবে তাও তিনি নিজেই লিখে দিয়েছেন—তার অংশবিশেষ হলো এই—

Here lies deposited,
the mortal part of a man,
who feared God, but not death;
and maintained independence,
but sought not riches;

who thought
none below him, but the base and unjust,
none above him, but the wise and virtuous".

স্যার উইলিয়াম জোন্স সেইসব বিদেশী পান্থদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারণ তিনি শুধু নিজেই প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় অগ্রণী হননি, তিনি রেখে গেলেন একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার প্রধানতম কেন্দ্র হয়ে আছে। ওদিকে নিজের দেশেও কবিখ্যাতি অল্প নয় তাঁর—তাঁর প্রভাব পড়েছিল সুদে, মুর, শেলী, টেনিসন, বায়রণ সকলের ওপরে। ভারতবর্ষে এসে অল্প কবিতাই তিনি লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটি কবিতার নাম Hymn to Narayana. এই কবিতাটির সঙ্গে শেলীর Hymn to Intellectual Beautyর তুলনা করে প্রফেসর হেউইট বলেছেন "They show great technical accomplishment and contain the best of his poetry and the deepest of his philosophy". সুদে এবং মুরে তাঁদের কবিতার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ব্যাখ্যা দিতেন তার মধ্যে জোন্সের কথা কেবলি উদ্ধৃত করতেন।

শুধু বহুভাষাতেই তাঁর অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল তা নয়। পারস্য ও ভারতের সাহিত্যেও তাঁর মন আশ্রয় পেয়েছিল। ভাষাকে বিদ্যার বাহন হিসাবে তিনি দেখেছিলেন এবং বহুভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদ্যার আসা যাওয়ার পথ খুলে দিয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার নিকট সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত তিনিই প্রথম করলেন—আজকের ভাষাতাত্ত্বিকেরা তাই তাঁকে পথপ্রদর্শকের সম্মান দিতে একটুও কুণ্ঠিত নন।

যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মত উদার হৃদয় ছিল জোন্সের। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ দেখা যায় নি। উপরন্তু এই

ধর্মমতগুলির প্রতি তাঁর ছাত্রসুলভ অনুসন্ধিৎসা ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে তুলনা করে তিনি যা বলেছেন তা গোঁড়া খৃষ্টানদের পক্ষে ক্ষোভের কারণ হলেও ভবিষ্যৎকালের কাছে তা তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির সাক্ষ্য দেবে। ১৮৮৭ সালের একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন "I am no Hindu ; but I hold the doctrine of the Hindus concerning a future state to be incomparably more rational, more pious and more likely to deter men from vice, than the horrid opinions inculcated by Christians on punishments without end". জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি খৃষ্টানই ছিলেন কিন্তু কখনোই ধর্মগত গোঁড়ামীর দ্বারা তাঁর বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হতে দেন নি।

রাজনীতির মধ্যে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী; তাঁর সমগ্র জীবন সেই আদর্শবাদের ছোঁওয়ায় উজ্জ্বল। সর্বতোমুখী প্রতিভা তাঁকে বিদেশী ভারত সাধকদের মধ্যে প্রধানতম স্থান দিয়াছে। সত্য-ভাষণের দুরন্ত সাহস, আপন বিচারবুদ্ধির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা সেদিনকার ইংলণ্ডে তাঁকে অপাংক্তেয় করে তুলতো। রাজনীতি তাঁর পক্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো। তিনি যে ইংলণ্ডে না ফিরে ভারতবর্ষের জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করলেন সে কথার উল্লেখ করে তাঁর অন্যতম জীবনীকার বলছেন—

"We can be glad that he never entered Parliament ; he would have had in all probability to sacrifice India on the alter of what could only have proved a political failure, for his independence no party could have stomached, his integrity no leader could have suborned."

ভারতবর্ষের ইতিহাস আর উইলিয়াম জোন্সকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। অতীতকালের ভারতবর্ষ যে ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প

ও আইনের সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষের এক দুর্দিনে সেই সৃষ্টির প্রচার কার্যে, পুনরুদ্ধার কার্যে তিনিই অগ্রণী হয়ে এগিয়ে এলেন। ভারতবর্ষের ঋণের অন্ত নেই তাঁর কাছে। তাঁর হাতে গড়া এসিয়াটিক সোসাইটি আজও তাঁর কাজ করে চলেছে। ভারতসাধনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ স্যার উইলিয়াম জোন্স এমনি একজন মানুষ যাঁর সম্বন্ধে যে কোন স্তুতিবাদই নিরর্থক। তাঁর এক বন্ধুর ভাষার পুনরাবৃত্তি করেই বলি—It is happy for us that this man was born.

চার্লস উইলকিন্স

বাংলা বইয়ের ছাপা ঝকঝকে হয়েছে—আরও ঝকঝকে হয়েছে তার মলাট। বইয়ের দোকানের শো কেসে দাঁড়ালে জুড়িয়ে যায় চোখ। পর্বতের কুয়াশা আর সমুদ্রের জোলো হাওয়ার ছোঁওয়াও যেন লাগিয়ে দেয় বর্ণবিচিত্র মলাটগুলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। নিখুঁত সৌন্দর্যের একটা ট্রাজেডী হলো এই যে তা তাঁর স্রষ্টাকে ভুলিয়ে দেয়। ভালো সিনেমা, ভালো থিয়েটার দেখতে দেখতে ভুলে যাই তাদের যারা পিছনে থেকে দিনের পর দিন এই সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে—আর কালি মেখেছে নিজেদের গায়ে। ঝকঝকে ছাপা বইয়ের বেলায়ও তাই—ঘরের বদ্ধ আকাশে, কালিমাখা গায়ে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে যারা সুন্দর করে ছেপে দেয় তাদের কথা মনে করে মন খারাপ করতে কেউ চায় না।

বাংলায় ছাপা বইয়ের মূলে যে ব্যক্তি তিনি বাঙ্গালী নন, ভারতীয়ও নন, তিনি ইংরাজ,—তাঁর নাম স্যার চার্লস উইলকিন্স। বড় বনেদী ঘরের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্যার পদবী নয়। বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধি আর উভয়ের সঙ্গে পরিশ্রমের মিলে চার্লস উইলকিন্স যা ঘটালেন তার অসীম মূল্য নামকরণের দ্বারা সীমায়িত করা যায় না। বাংলাদেশের ইতিহাসে সভ্যতার অগ্রগতির যাঁরা পথ কেটেছেন তাঁদেরই একজন হিসাবে স্যার চার্লস উইলকিন্সের নাম থাকবে চিরকাল। বাংলাভাষা যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্ম দিল, বাংলাসাহিত্যের চর্চা যে ঘরে ঘরে আজ ছড়িয়ে গেছে তার পিছনে আছে উইলকিন্সের সাধনা—প্রথম বাংলা হরফের ছাপার কৃতিত্বের যিনি অধিকারী। বনেদীয়ানার গৌরব উইলকিন্সের ছিল না। মানুষ হিসাবেও তাঁর এমন কোন মহত্ত্বের লক্ষণ

বালককালে দেখা যায়নি যার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত সন্ধান করা যায়। ১৭৪৯ সালে তাঁর জন্ম—১৭৭০ সালে এলেন ভারতে। এই একুশ বছর এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যা কেউ মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেছে। পিতা ওয়াল্টার উইলকিন্স যে খুব একটা করিতকর্মা লোক ছিলেন তা নয়। পুত্রের সুশিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত তিনি করতে পারেন নি। সেদিনকার ইংলণ্ড আজকের ইংলণ্ড নয়। সুস্থ সবল যুবক মাত্রেরই কাজ জুটবে এবং কাজ না জুটলে বেকার ভাতা জুটবে এ আইন ছিল না। তবে একটা পথ ছিল; দুঃসাহসী ক্লাইভ প্রমাণ করে দিয়েছে যদি উৎসাহ থাকে তবে সাতসমুদ্র পেরিয়ে চলে যাও, দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গের সমুদ্রতীরে নদীকূলে ছাউনি পেতে বসেছে কোম্পানী। সোনার ভারতবর্ষ তার সমস্ত ঐশ্বর্যের হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তারই ডাকে কত ঘর ছাড়া প্রাণ ছুটে এলো ভারতবর্ষে। চার্লস উইলকিন্স তাদেরই একজন।

১৭৭০ সাল ভারতবর্ষে এসে নামলেন অখ্যাত অনভিজ্ঞ যুবক চার্লস উইলকিন্স। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটারশিপের কাজ নিয়ে চলে গেলেন মালদায়। দৈনন্দিন চাকরী তাঁর জীবনে কখনো সর্বস্ব হয়ে ওঠে নি। অবকাশ মুহূর্ত বৃথা অপব্যয় করার মতো স্তিমিতচিত্ত লোক তিনি ছিলেন না। বাংলা ও ফার্সী, পরে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে হ্যালহেডের সঙ্গে। হ্যালহেডের নাম বাঙ্গালীর ইতিহাসে কেরী, উইলকিন্সের মতই উজ্জ্বল। সংস্কৃত মোটামুটি আয়ত্ত করে বাংলা শিখেছিলেন হ্যালহেড, ফলে বাংলা ব্যাকরণের একটা কাঠামো মনে মনে গড়ে তুললেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী নিয়ে তখন দলে দলে ইংরাজ আসছে বাংলায়। বাংলা ভাষা জানা প্রয়োজন তাদের। হ্যালহেড সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখে ফেললেন। হ্যালহেডের ছাপা ব্যাকরণেই প্রথম

বাংলা হরফ দেখা দিল। সেদিন এই যুগান্তকারী কাজের মূল্য দেবার লোক ছিল না, সভাসমিতির সম্বর্ধনা ছিল না, সবার চোখের আড়ালে ঐ ব্যাকরণের বাংলা টাইপ তৈরি করলেন চার্লস উইলকিন্স। টাইপ তৈরির নেশা তাঁর এমনিই ছিল, তাকে এবার কাজে লাগাবার সুযোগ পেলেন। নিজের হাতে খোদাই করলেন বাংলা টাইপ। যেদিন বাংলা সাহিত্য এগিয়ে চলতে শুরু করলো সেদিন বাংলা হরফের প্রথম স্রষ্টার স্মৃতি কোথায় হারিয়ে গেল। হালহেড তাঁর ব্যাকরণ ছাপিয়েছিলেন হুগলীর মিষ্টার এনড্রুজের প্রেস থেকে। অনুরোধ করলেন বন্ধুকে বাংলা টাইপের একটা ব্যবস্থা করতে—He appealed to his friend Charles (afterwards Sir Charles) Wilkins, a Bengal Civilian and a great oriental scholar to help him with the required founts. Charles Wilkins had already certain founts as a hobby and this request from his friend made him earnest. He took upon himself the task of making all the Bengali types needed for printing the Grammar and actually did the job with his own hands by the means of a chisel. পরবর্তীকালে রেভারেণ্ড লং তাঁকে Caxton of Bengal বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে একজন বাঙালী কর্মীকেও উইলকিন্স নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছিলেন, তাঁর নাম পঞ্চানন। তিনি পরে উইলিয়াম কেরীর সঙ্গে শ্রীরামপুর প্রেসে কাজ করেন সুদীর্ঘকাল।

বলাবাহুল্য আজকের নিত্যনূতন ছাপাখানা গড়ে ওঠার যুগে প্রায় দুশো বছর আগেকার এই কাজকে অতি সামান্য বলে মনে হওয়াই সম্ভব। এমন নয় যে উইলকিন্স সারা জীবন টাইপ আর তার ছাঁচ তৈরি করে এসেছেন। পড়াশুনায় তাঁর গভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করা গেছে

বরাবর। তবু উদ্যোগী পুরুষ সিংহ কোন বাধা মানলেন না। তাঁর অধ্যবসায়, তাঁর গভীর মনোনিবেশ, তাঁর একাগ্র চেষ্টার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং হ্যালহেড :

In a country so remote from all connexions with European Artists he has been obliged to change himself with all the various occupations of the Mettalurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add application of personal labour. With a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art as well as the disadvantages of solitary experiment.

ছাপাখানা যে মানবসভ্যতায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে সে সম্বন্ধে আমাদের চেতনা এতই অসাড় যে এ নিয়ে কোন লক্ষ্যণীয় আলোচনা আমাদের ভাষায় আজও হয়নি। ফলে ছাপাখানার গুরুত্ব যেমন আমরা কখনো ভেবে দেখি নি তেমনি তার স্রষ্টাদের জন্যেও কোন আন্তরিক শ্রদ্ধা আমাদের নেই।

আগেই বলেছি বাংলা টাইপের হরফ তৈরির দ্বারা তাঁর প্রভাব সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী হলেও উইলকিন্স নিজে একজন যথার্থ পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। উইলিয়াম জোন্স ভারতবর্ষে এসে উইলকিন্সের সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা দেখে বিস্মিত হলেন। উইলকিন্সই প্রথম ইউরোপীয় যিনি ভাল করে সংস্কৃত ভাষাকে দখল করেছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জোন্স এলেন ভারতবর্ষে। সংস্কৃত ভাষা চর্চার গভীর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে তাঁর একটুও দেরী হয়নি। তিনি দেখলেন যে তাঁর আগেই ভাল করে সংস্কৃত শিখেছেন উইলকিন্স। উইলকিন্সের সহায়তার ফলেই যে তিনি সংস্কৃতভাষা শিখতে পারলেন সে কথা

তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—But for his aid, I would have never learned Sanskrit."

ইতিমধ্যে তিনি একটি বড় কাজে হাত দিয়েছিলেন। তা হলো ভগবৎগীতার অনুবাদ। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ভারতীয় শাস্ত্রের দ্বারাই, ভারতীয় আইন ও রীতিনীতির দ্বারাই ভারতের শাসন চালাতে হবে। হেষ্টিংসের সঙ্গে উইলকিন্সের ইতিমধ্যে যোগাযোগ ঘটেছে। তাঁরই উৎসাহে উইলকিন্স গীতা অনুবাদে মন দিয়েছেন এ কথা মনে হলেও তার কোন সঠিক প্রমাণ নেই। তবে ভাগবদ্গীতা যে হেষ্টিংসের উৎসাহে মুদ্রিত হয়ে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করলো তা হেষ্টিংসের একটি চিঠিতেই প্রমাণ—"My friend Wilkins has lately made me a present of a most wonderful work of antiquity and I am going to present it to the public."

তিনি এই বই ইউরোপে পাঠালেন কোম্পানীর কর্মকর্তাদের কাছে, আবেদন জানালেন যে এই বই যেন ছাপানো হয়—আর একটি চিঠিতে লিখেছেন 'আমি উইলকিন্সের এই সৃষ্টি মিঃ ন্যাথানিয়েল স্মিথকে পাঠিয়েছি, যাতে তিনি কোর্ট অফ ডিরেকটর্সের হাতে এটা পৌঁছে দেন এবং তাঁরা যেন ছাপেন।' "I have sent a curious production of Wilkins' to Mr. Nathaniel Smith, with a request that he will present it to the Court of Directors and that they will cause it to be printed.' হেষ্টিংসের অনুরোধেই হোক বা বিষয়বস্তুর গৌরব উপলব্ধি করেই হোক কোর্ট অফ ডিরেকটরস্ সে গ্রন্থ ছেপে প্রকাশ করলেন। সে অনুবাদের দ্বারা ভারতবর্ষ তার অতীত ঐশ্বর্যের প্রথম পরিচয় পৌঁছে দিল ইউরোপের কাছে—উৎসাহী ইউরোপ ফরাসী ও জার্মান ভাষায় তার রূপান্তর ঘটালো।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করলেন উইলিয়ম জোন্স। তখনকার ভারতবর্ষে যে অল্প কয়েকজন প্রবাসী ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় উৎসুক হয়েছিলেন তাঁদের সকলকেই তিনি ডেকে নিলেন। তাদের মধ্যে প্রধানতম চার্লস উইলকিন্স। আবার যখন ১৮২৬ সালে ইংলণ্ডে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেখানেও উদ্যোক্তাদের মধ্যে দেখি চার্লস উইলকিন্স।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে উইলকিন্সের পরিচয় গভীর হলো। উইলকিন্সের কর্মদক্ষতার উপর হেস্টিংসের ছিল অগাধ বিশ্বাস। উইলকিন্স যখন কলকাতায় সরকারী ছাপাখানার অধিকর্তা তখন তাঁকে সরকারী কাজে হেস্টিংস একবার উত্তরপ্রদেশে পাঠান। কাজের ধরন সম্পর্কে বলা হচ্ছে 'He was sent to the upper Provinces on a kind of literary mission.' পাটনা থেকে শিখদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি হেস্টিংসকে একটি রিপোর্ট পাঠালেন। পুণ্যভূমি বারাণসী তাঁর মন জয় করলো। সেখানে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরাট গৌরব যেন তিনি দেখতে পেলেন। কলকাতায় যাবার অসুবিধার উল্লেখ করে উইলকিনস লিখেছেন যে যদি কাশীতে তাঁকে বৃত্তি দিয়ে রাখা হতো তাহলে তিনি পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সাহায্য পেতে পারেন—বারাণসী তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কারণ 'he may enjoy the assistance of the wisest Pundits'.

শরীর ও মন যখন কাজের চাপে অবসন্ন তখন উইলকিন্স শরীর সারাতে ইউরোপে ফিরতে মনস্থ করলেন। ইতিমধ্যে ফার্সী অক্ষর নিজের ছাঁচে তৈরি করে উইলকিন্স ব্যালফরের forms of Herkiri গ্রন্থ ছাপবার ব্যবস্থা করে দিলেন। মনুসংহিতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ তিনি ইতিমধ্যেই অনুবাদ করে ফেলেছেন। ভগ্নস্বাস্থ্য পীড়িত উইলকিন্স ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ছেড়ে চললেন।

ইংলণ্ডের একটি ছোট শহর বাথে গিয়ে তিনি বাসা বাঁধলেন। কিন্তু শান্ত জীবন যাপনের অবকাশ পেলেই বা মন তাতে বসবে কেন? তিনি যে নতুনের সন্ধান পেয়েছেন মন তারই স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমুদ্রপার থেকে ভেসে আসে কানে উদাত্ত সংস্কৃতের আহ্বান। শরীর সুস্থ হতে না হতেই অনুবাদে হাত দিলেন—প্রকাশিত হলো অল্পকালেই হিতোপদেশের ইংরাজী সংস্করণ। ইতিপূর্বেই হিতোপদেশের গল্প য়ুরোপে গিয়ে পৌঁচেছে তবু তাঁর গ্রন্থ অনাদৃত হয়নি। সংস্কৃত ভাষা জোন্স, হ্যালহেড, কোলব্রুক, কেরী সকলেরই কি অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। সভ্য জাতির গর্ব নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন। কেউ এসেছিলেন তমসাচ্ছন্ন ভারতকে ধর্মের আলো দিতে, কেউ এসেছিলেন অসভ্যকে সভ্য করতে,—কিন্তু এই একটি জায়গায় সকলেই নতশির—সংস্কৃত ভাষাকে রাজকীয় সম্মান দিয়ে তাঁরা ধন্য। উইলকিন্স নিজেই বলছেন—চীনের প্রান্ত থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত প্রাচ্যের প্রত্যেকটি দেশে, যার মধ্যে সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী দ্বীপগুলিকেও ধরছি, এই ভাষার বিজয় অভিযান চলেছে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা রাজ্যজয়ের ফলে। তার প্রভাব ছড়িয়ে গেছে ধর্মে বিজ্ঞানে কলায়; তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে উত্তরে তিব্বতে এবং তুষারশৃঙ্গ পর্বতাঞ্চল থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ পর্যন্ত।

তিনি যে মহাভারতের গল্পে মুগ্ধ হয়ে তার অংশবিশেষের অনুবাদ শুরু করেন তার প্রমাণ হেস্টিংসের চিঠিতেই আছে। সে অনুবাদ কতদূর করেছিলেন তা আজ আর সঠিক জানবার উপায় নেই। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশিত হলো।

দক্ষিণ ভারতের দুর্ধর্ষ বীর টিপু সুলতান বীরবিক্রমে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা তো করেই যাচ্ছিলেন উপরন্তু ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে মাঝে মাঝে আক্রমণ করে ইংরাজ সরকারকে সদাসর্বদা ও ত্রস্ত করে তুলছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুকে পরাজিত করে

ইংরাজ সৈন্য শ্রীরঙ্গপত্তম অধিকার করলো। মণিমুক্তা কি পাওয়া গেল তার হিসেব কেই বা রাখে কিন্তু টিপুর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের বিরাট বোঝা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভাবিয়ে তুললো। সেই সংগ্রহ যখন বিলেতে পৌছালো তখন সমস্যা হলো এগুলির দেখাশোনা কে করে। সমস্যা মাত্রেরই সমাধান আছে। চার্লস উইলকিন্স তাদের দায়িত্ব নিলেন। ১৮০০ সালে তাঁকেই পরিচালক করে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর উদ্বোধন হলো।

কলকাতায় যখন সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হলো তখন ইংলণ্ডেও হেলিবারী কলেজ ঐ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। যারা ভারতবর্ষ শাসন করতে আসবে তারা যে শুধু স্থানীয় ভাষাগুলি জানলেই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন তা নয়—এ সতর্কবাণী উইলকিন্স বারবার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এইসব ভাষাগুলির মাতৃস্থানীয়া সংস্কৃতকে জানতে হবে—না হলে ভারতবর্ষকে মোটেই জানা যাবে না। ঐ একই কথা একই সময়ে কলকাতায় বলতে লাগলেন কোলব্রুক। পরস্পরের অজান্তে দুজনেই সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে আরবী পারসীর চর্চা কমে গেলেও তিনি কোনদিন তা একেবারেই বন্ধ করেন নি। ১৮০৬ সালে রিচার্ডসনের আরবী-পারসী-ইংরাজী অভিধানের প্রথম খণ্ড সংকলন করলেন তিনি।

উইলকিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হলো ১৮০৮ সালে। কোলব্রুকের ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৮০৫ সালে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উইলকিন্সই যে প্রথমে রচনায় হাত দেন এবং তা সমাপ্ত করেন তা আমরা জানি। যখন কলকাতায় একটু একটু করে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ছেন তখনই পুরুষোত্তমের রত্নমালা, বোপদেবের মুগ্ধবোধ থেকে অংশবিশেষ নিজের জন্য অনুবাদ করেন। অনুবাদের অংশগুলি আর পাণিনির সূত্র, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা সঙ্গে করে

ইংলণ্ডে এনেছিলেন। সেইগুলির উপরে ভিত্তি করে উইলকিন্স সংস্কৃত ব্যাকরণ শেষ করেন ১৭৯৫ সালে। ঐ বছরের মে মাসে ছাপাবার আয়োজন নিজেই সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি। নিজের হাতে ইস্পাত কেটে অক্ষর তৈরি করলেন, ছাঁচ তৈরি করলেন। নিজের বাড়িতে ছাপাখানার সমস্ত আয়োজন গুছিয়ে ফেললেন। প্রথম ষোলপাতা প্রুফও নেওয়া হলো কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস—বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। অতিকষ্টে পুথিগুলি বাঁচালেন উইলকিন্স। তাঁর নিজের বক্তব্য তাঁর ভাষাতেই তুলে দেওয়া গেল—

At the commmencement of the year 1795, residing in the country, and having much leisure, I began to arrange my materials and prepare them for publications. I cut letters in steel, made matrices and moulds and cast from them a fount of types of the Devnagari character all with my own hands ; and with the assistance of such machanics as a country village could afford I very speedily prepared all the other implements of printing in my own dwelling house ; for by the second of May of the same year, I had taken proofs of sixteen pages, differing but little from those now exhibited in the first two sheets. Till two o'clock on that day everything had succeeded to my expectations ; when alas ! the premises were discovered to be in flames, which spreading too rapidly to be extinguished the whole building was presently burnt to the ground. In the midst of this misfortune, I happily saved all my books and manuscripts and the greatest part

of the punches and matrices; but the types themselves having been scattered over the lawn, were either lost or rendered useless.

এটা হলো ১৭৯৫। অধ্যাপনার কাজে নেমে দশবারো বছর পরে আবার প্রবল উৎসাহে কাজে লাগলেন তিনি। তাঁরই হাতের তৈরি অক্ষরে আবার ব্যাকরণ ছাপা হলো। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর ব্যাকরণ প্রকাশিত হলো।

ছাত্রদের জন্যে তিনি আরও একটি বই লিখেছিলেন—১৮১৫ সালে সেটি প্রকাশিত হয়—The Radicals (Roots) of the Sanskrit language.

এমন এক একজন কর্মচঞ্চল মানুষ পৃথিবীতে আসেন যাঁদের জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত গৌরব শুধু কাজের মধ্যেই। পারিবারিক জীবন তাঁদের কর্মব্যস্ততার জাল ভেদ করে কদাচিৎ প্রধান হয়ে ওঠে। উইলকিন্সের পারিবারিক জীবন তাঁর কর্মজীবনের অন্তরালে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—শুধু এইটুকু জানি তিনি দুবার বিয়ে করেছিলেন—তিনটি কন্যা ছিল—পারিবারিক জীবনে অশান্তি তাঁকে বেশি ভোগ করতে হয়নি।

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রধান নেতা চার্লস উইলকিন্স। দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদকে নানা কর্মের ফসলে তিনি সার্থক করে তুললেন। দেশ দেশান্তর থেকে তাঁর কর্মের স্বীকৃতি তাঁকে শেষ জীবনে নিশ্চয়ই তৃপ্তি দিয়েছিল। রয়েল সোসাইটির ফেলো করে নেওয়া হয় তাঁকে, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রয়েল ইনস্টিট্যুট অফ লিটারেচার তাঁকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যর চার্লস উইলকিন্স। ফরাসী বিদগ্ধপণ্ডিতদের প্রতিষ্ঠান ইনস্টিট্যুট অ ফ্রাঁস তাঁকে বিশেষ সদস্য মনোনীত করলো।

চার্লস উইলকিন্স

১৮৩৬ সালে ১৩ই মে লণ্ডনে যখন ইনফ্লুয়েঞ্জায় তিনি মারা গেলেন তখন তাঁর বয়স ছিয়াশী।

বাংলাদেশ তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলেছে। অথচ এইসব বিদেশী পান্থদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাঁকেই মনে রাখা উচিত ছিল আমাদের। আমাদের বিদ্যার পুনর্চর্চার দ্বারাই যে তিনি খ্যাতিমান তা নয় বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের মূলে আছে তাঁর অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা আর শুভ ইচ্ছা। বাংলার নবজাগরণের দুই প্রধান পুরুষ নিজেদের কাজের জন্য নিজেরাই ছাপাখানা বসিয়েছিলেন—রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। তাঁদের মধ্য দিয়ে যে নবপ্রাণের প্রবাহ ছুটলো তারও যান্ত্রিক চাবিকাঠিটি উইলকিন্সেরই দেওয়া।

ভাল ছাপার ঝকঝকে বই যখন পড়ি তখন তাঁকে মনে করি না কখনো, অভ্যস্ত পথে চলতে চলতে প্রথম পথিককে যেমন ভুলেও মনে করি না। প্রথম পথিক পথ কাটে, পাথর সরায়, সাফ করে জঙ্গল, পরে যারা আসে তারা ভাবে বরাবর বুঝি এমনিই ছিল।

উইলিয়াম কেরী

দশ হাজার মাইল পথ পার হয়ে জাহাজ এলো ভারতবর্ষের কূলের কাছে। আর মাত্র দুশো মাইল বাকী। এমন সময় আকাশ কালো করে উঠলো ঝড়, দিগন্ত জুড়ে এলো ঘন মেঘ, বিরক্ত সিংহের মূর্তি সমুদ্রের। উদ্দাম তরঙ্গের চূড়ায় দুলতে লাগলো জাহাজ। সামুদ্রিক দুর্যোগ নানা রূপ নিয়ে ঐ দুশো মাইল কিছুতেই পেরুতে দেয় না। ১৭৯৩ সালের নভেম্বর মাস—প্রিন্সেস মারিয়া জাহাজে সপরিবারে বাংলায় আসছিলেন উইলিয়াম কেরী। প্রায় একমাস জাহাজে সমুদ্রে যুদ্ধ চললো। জাহাজের ক্যাপ্টেন নানা কৌশলে, গভীর একাগ্রতার সঙ্গে জাহাজ বাঁচিয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে একদিন কলকাতার ঘাটে এসে পৌছলেন তারা। কেরী এসেছিলেন ধর্মপ্রচারক হয়ে। জাহাজের এই দুরবস্থার মধ্যে তিনি ভগবানের আশীর্বাদ খুঁজে পেলেন—যেন তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যই এই বাধা, যেন বিপদ-আপদের মধ্যেও আদর্শে অবিচল থাকার এটা ইঙ্গিত—"We Christians have to work against wind and currents ; and we must if we are to make our harbour."

প্রকৃতির রুদ্রমূর্তির মধ্যে আসন্ন বিপদ ও বাধার যে পূর্বসূচনা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মনে মনে তা মিথ্যা নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত ধর্মোন্মত্ত একটি দেশে, নিজের অর্ধোন্মাদ স্ত্রী ও পুত্র-পরিবার নিয়ে, অতি অল্প অর্থসংস্থান নিয়ে উইলিয়াম কেরী এসে নেমেছিলেন। ভাষা জানা ছিল না, দেশের মানুষদের রীতিনীতি সম্পূর্ণ অপরিচিত—তবু অদম্য উৎসাহে কেরী এসে দাঁড়ালেন জাহাজ-ঘাটায়। সঙ্গে পাগল টমাস—কোন বিষয়েই যাঁর বুদ্ধি স্থির নয়।

উইলিয়াম কেরী

বালককালে উইলিয়াম কেরীর খ্যাতি ছিল পরিশ্রমী বলে। তীক্ষ্ম মনোযোগ আর অধ্যবসায় ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। নজর ছিল বিজ্ঞান আর ভ্রমণকাহিনীর দিকে—বন্ধুরা ভ্রমণকাহিনীর প্রতি আত্যন্তিক পক্ষপাত দেখে নাম দিয়েছিল কলম্বাস। নানা দেশের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের ভাষার প্রতি অনুরাগ জাগলো। মনে হতে পারে যে বইয়ের পোকা হয়ে তাঁর বাল্যজীবন কেটেছে। তা কিন্তু আদৌ সত্যি নয়। খেলাধুলায় তার ঝোঁক ছিল ঐ বয়সের ছেলেদের মতই স্বাভাবিক। কিন্তু বালক কেরীর যথার্থ আশ্রয়স্থল ছিল ছায়াচ্ছন্ন বহু বিচিত্রবৃক্ষের বনাঞ্চল। গাছপালার সাহচর্যে শুধু ঘরের বাইরের সময়টুকু কাটতো তাই নয় ঘরে বিছানার পাশেও নানা ধরনের গাছপালা জড়ো হয়েছিল। এই বোবা বন্ধুদের প্রতি তাঁর ছিল আশ্চর্য মমতা—পরবর্তী জীবনে তিনি যে বাংলাদেশে এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মধ্যে ঐ বালকেরই পরিণতি দেখি আমরা—পথে পথে এই গাছগাছড়া খুঁজে বেড়ানো শুধু খেলা নয়, তাদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবরও তার জানা থাকতো। পাড়ায় অজানা গাছ দেখলে লোকে বলতো উইলিয়ামের কাছে যাও, বলে দেবে সঠিক এর ঠিকুজী-কোষ্ঠী।

১৭ই অগস্ট ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে কেরীর জন্ম। যে গ্রামে জন্মেছিলেন তার নাম পলার্সপিউরী। বৃদ্ধা ঠাকুমার চোখের আলো হয়ে শিশু উইলিয়ামের শৈশব নেচে-খেলে কেটেছে। বাবা এডমণ্ড কেরী ছিলেন পেশায় তাঁতি পরে স্কুল-শিক্ষক। ফলে অন্যান্য গ্রাম্য-বালকদের তুলনায় তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল। ধর্মের বইতে যে বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল তা নয়; কিন্তু বাবা যার শাসন ছিল ঐটুকুই; নিয়মিত বাইবেল পড়া আর চার্চে যাওয়ার মধ্যে ফাঁকির পথ ছিল না। কোন কাজেই পারি না বলে পেছিয়ে যাওয়া ছিল না বালক কেরীর স্বভাবে। বোন মেরী বলছেন :—'যা তিনি

আরম্ভ করতেন তাই শেষ করতেন। অসুবিধায় পিছিয়ে যেতেন না কখনো।'

বারো বছর বয়সে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে উইলিয়াম কেরীর চাষ করবার বা বাগান বানাবার সখ হলো। নেমে পড়লেন মাঠে। দু'বছর রোদে-জলে ভিজে নানাধরনের গাছগাছড়া নিয়ে গবেষণা হলো। কিন্তু স্বাস্থ্যে সইলো না—হাত-মুখ জলে গেল, গায়ের চামড়া গেল ঝলসে। সর্বাঙ্গের জলুনীতে ঘুম ছুটে গেল রাতের। শেষকালে ছেড়ে দিতে হল মাঠের খেলা। বাংলাদেশের প্রচণ্ড সূর্যে তাঁর জীবনের চল্লিশ বছর কাটবে তা কি তখন স্বপ্নেও ভেবেছেন।

যখন মাঠের কাজ ধাতে সইলো না তখন জুতো তৈরির কাজ শিখতে গেলেন হ্যাকলটনে ক্লার্ক নিকলসের কাছে। জুতো তৈরি থেকেই কেরীর যথার্থ কর্মজীবনের সুরু—শেষ যীশুর বাণী প্রচারে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ঘটলো। নিজেই বলতেন পরবর্তীকালে যে তাঁর তৈরি জুতোর আদর ছিল। অনেকদিন পরে তিনি যখন ভারতবর্ষের এক গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন তখন অল্পবয়স্ক একজন রাজপুরুষ তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যে তিনি প্রথম জীবনে জুতো তৈরি করতেন। কেরী তৎক্ষণাৎ বল্লেন, 'না ঠিক জুতো তৈরি আমি করতুম না, আমি ছিলুম মুচী।' "No, Not even shoemaker, just a cobbler." ক্লার্ক নিকলসের কাছে পরিশ্রম করতে হতো যথেষ্ট—তবু তারই মধ্যে ফাঁক করে নিয়ে প্রত্যেক রবিবার তিনি পলার্সপিউরী ছুটতেন তাঁর শিক্ষক টমাস জোনসের কাছে গ্রীক শিখতে।

বিপথে যাবার সম্ভাবনা তাঁর এই সময়ে যথেষ্ট ছিল—তা থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন জন ওয়ার। জন ওয়ারও ক্লার্ক নিকলসের কাছেই কাজ করতেন। এই শান্ত মানুষটি কেরীর জীবনকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ওয়ারের বক্তৃতায় কেরী মুগ্ধ হতেন—

মনে হতো এতো পেশাদার ধর্মযাজকের বক্তৃতা নয়, সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন ওয়ার কথা বলে। কেরী প্রতিজ্ঞা করলেন যে মিথ্যা বলবেন না, শপথ নেবেন না, যা কিছু পাপ বলে জানেন সব থেকেই দূরে থাকবেন। জন ওয়ার কি তখন ভাবতেও পেরেছিলেন যে যে মানুষকে তিনি ধীরে ধীরে পরম করুণাঘন যীশুখৃষ্টের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলছেন সেই মানুষটিই পরবর্তীকালে ধর্মপ্রচারের ব্রত নিয়ে সাগরপারে পাড়ি দেবে।

কিন্তু জীবনের সমস্ত রস ভগবৎসাধনায় চালিয়ে দেবার মত একদেশদর্শী ছিলেন না উইলিয়ম কেরী। এরই মধ্যে প্রথম প্রেমের স্নিগ্ধ কিরণোচ্ছ্বাস দেখা গেল। টমাস ওল্ডের শ্যালিকা ডরোথি প্লাকেটকে কেরী বিয়ে করলেন ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন। অশিক্ষিতা ডরোথি রুচিহীনা ছিলেন না। বয়সে কেরীর চেয়ে তিনি ছিলেন পাঁচ বছরের বড়। সুখে আনন্দে কেরীর দিন কাটতে লাগলো। একটি সন্তানও হলো। কিন্তু দুটি বছর যেতে না যেতেই একদিন অতি সামান্য জ্বরে প্রথম সন্তানের মৃত্যু হলো। প্রথম সাংসারিক আনন্দের পূর্ণ প্রকাশের আগেই জীবনের আকাশ ঢেকে গেল কাল মেঘে। জীবনীকার বলছেন "Then ague for eighteen months distressed in making him bald at twenty-two".

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি আর্লস বার্টন গ্রামে প্রথম ধর্মকথা শোনালেন। জলে ঝড়ে কাদায়, বছরে বারোমাস নানা অবস্থায় তিনি যেতেন—আর্লস বার্টনের গ্রামবাসীরা যে সব সময়ে তাঁকে পাথেয় জোগাতে পেরেছে তাও নয় তবু কর্তব্যে ত্রুটি ছিল না কেরীর। তাঁর নিজের গ্রাম পলাস'পিউরীর লোকেরা জানলো যে তাদেরই ছেলে উইলিয়াম ধর্মপ্রচারে মেতেছে। সেখানেও ডাক পড়লো। এলিজাবেথ কেরী গর্বভরে জিগ্যেস করতে লাগলেন "And will my boy make a preacher?"

"Yes a great one if God spares him"—উত্তর পেতেন তিনি।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর মাসে জন রাইল্যাণ্ডের পৌরোহিত্যে তিনি দীক্ষিত হলেন। তখনও তিনি জুতো তৈরির কাজই করেন। অতি অল্পকয়েকজন বন্ধু সেখানে এসে মিলেছেন। ভোর হয়নি ভাল করে তখনও। সাড়ে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে নেন নদীর ধারে কেরী এসে দাঁড়ালেন। রাইল্যাণ্ড পরবর্তীকালে বলছেন "On October 5, 1783, I baptized in the Nene, just beyond Doddridge's meeting-house, a poor journeyman shoemaker, little thinking that before nine years had elapsed he would prove the instrument of forming a society for sending missionaries from England to the heathen world, and much less that later he would become professor of languages in an Oriental college and the translator of the scriptures into eleven different tongues."

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আর একটি চমকপ্রদ বই কেরীকে চিন্তিত করে তুললো। ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণকাহিনী পড়তে তাঁর ভালই লাগলো। ক্যাপ্টেন কুক পেরুতে একটি কাঠের ক্রুশ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বইতে লিখলেন যে এসব অঞ্চলে যীশুর প্রেমের মন্ত্র কোনদিনই পৌঁছে দেওয়া যাবে না—তিনি যতই জোর দিয়ে বললেন 'I may pronounce that it will never be undertaken'—ততই কেরীর মনে প্রশ্ন জাগতে লাগলো—কেন নয়? কে জানে হয়তো তখন থেকেই দূর সমুদ্রের জলো হাওয়া লেগেছিল তাঁর কল্পনায়—মন উন্মুখ হয়েছিল কবে বিশ্বের অন্য প্রান্ত থেকে ডাক আসবে প্রভু যীশুর পরম বাণী বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মুল্টনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। কখনো শিক্ষক, কখনো ধর্মপ্রচারক হলেও জুতো তৈরির কাজ তিনি তখনো

করে যাচ্ছেন। অশেষ কষ্টের মধ্যে বিপুল সংগ্রাম করে তাঁকে দিন কাটাতে হত। তারই মধ্যে লাটিন, গ্রীক, হিব্রুর চর্চা চলছে। এগুলোতে একটু প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ধরলেন ইটালীয়ান, ফ্রেঞ্চ ও ডাচ ভাষা।

যথার্থ খৃষ্টান মাত্রেরই খৃষ্টের বাণীকে দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য—এই কথা বন্ধুজনদের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিনি একটি আবেদন লিখলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন গাছপালার জন্য যেমন সূর্যালোক অবশ্য প্রয়োজনীয় মানুষের জন্য তেমনি খৃষ্টের বাণী। তিনি লিখেছেন—"কিসের জন্যে দীক্ষা আমাদের? দীক্ষার সঙ্গে যা সম্পর্ক বিশ্বজুড়ে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সম্পর্ক তার চেয়ে কম নয়। একই আদেশে এ দুয়ের জন্ম—অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত এরা।···মানবতার বিরাট অংশ যখন খৃষ্টের সঙ্গে পরিচিত নয় তখন আমাদের কোন দায়িত্ব নেই এমন কথা কে বলবে।" বিশ্বজুড়ে মিশনারীর ব্রত নেবার ডাক ইতিপূর্বে এমন করে কেউ দেয়নি।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সমিতির সভায় কেরী আবার ঐ আহ্বান দিলেন। তাঁর ভাষণ সমিতির সভ্যদের অকর্মণ্যতার জন্য তীব্র ক্ষোভে ও দুঃখে পূর্ণ। গতানুগতিক ধর্মসভার বাক্যাড়ম্বর ত্যাগ করে তিনি দেশদেশান্তরে খৃষ্টের সীমানা বিস্তারের কথা বলেন। তাঁরই উৎসাহে অখৃষ্টানদের মধ্যে গসপেল প্রচারের জন্য ব্যাপটিস্ট সোসাইটি তৈরি করার প্রস্তাব নেওয়া হলো। সমিতির তৃতীয় সভায় তিনি নিজে যেতে পারেন নি। কিন্তু তিনি একটি চিঠি লিখে বাংলাদেশ-আগত মিশনারী জন টমাসের কথা জানালেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে টমাস গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। খৃষ্টধর্ম প্রচারের বাসনা থাকলেও তিনি নিজে খুব কিছু করে উঠতে পারেন নি। তবে চলনসই বাংলা শিখে নিয়েছিলেন। টমাসের পরিচয় দিতে গিয়ে একজন বলছেন—"He had been a great

human, a great christian, a great missionary, a great unfortunate and a great blunderer.' টমাস চাইলেন কেরীকে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে। সমিতির সম্পাদক ফুলার গেলেন লণ্ডনে এ সম্বন্ধে খবরাখবর নেবার জন্যে।

৯ই জানুয়ারী ১৭৯৩ সালে ফুলার কেটারিঙে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সমিতির সভায় টমাস সম্বন্ধে যা তাঁর ধারণা তা জানালেন। সমিতির অধিবেশন শেষ হবার মুখে খোঁড়া পা নিয়ে টমাসও এলেন। ভারতবর্ষের দুঃখ দারিদ্র্য (দৈহিক এবং আত্মিক) প্রভৃতির কথা বললেন। বললেন তাঁর সহকারী বন্ধু রামরাম বসুর কথা। এখানে টমাস একটু বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। দুটি ব্রাহ্মণের লেখা চিঠি ছিল তাঁর সঙ্গে—"আমাদের প্রতি করুণা করে প্রচারক পাঠাও।" অত্যন্ত অল্প খরচে বাংলা দেশে থাকা যায় আজ না হলেও দুদিন পরে মিশনারীরা নিজেদের খরচ নিজেরাই তুলতে পারবে এই সব ভরসা দিলেন। উত্তেজিত কেরী বাংলায় যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আহতপদ টমাস জড়িয়ে ধরলেন কেরীকে—অবিশ্রান্ত অশ্রুধারায় ব্যক্ত করলেন তাঁর গভীর আনন্দ।

টমাস কুকের রচনা পড়ে কেরীর তাহিটি যাবার স্বপ্নই ছিল এতদিন। তাহিটির পথ দূরে রইলো পড়ে। কেরি তৈরি হতে লাগলেন বাংলাদেশে যাবার জন্য। সমিতি ভাল করে ভাববার, বিচার করবার সময় পেল না। টমাসের ভাবাতিশয্যে ভেসে গেল সবাই।

কেরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ যত সহজ হলো, ডরোথিকে রাজী করানো তত সহজ হলো না। ডরোথি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো—কান্নাকাটি হৈ চৈ সবই হলো—এক মাসের মধ্যেই ডরোথির মাতৃত্বের সম্ভাবনা, সে মানুষ হয়েছে সমুদ্র থেকে দূরে পিডিংটনে, পথে দুর্যোগ অনেক, জাহাজ ডুবতে পারে, জলদস্যুতে লুঠ করতে পারে, সেখানকার ভাষা অজানা—ডরোথি একের পর এক আপত্তি তুলতে লাগলো—

কেরীর সঙ্গে কিছুতেই সে যাবে না তাও জানালে। কেরী কিন্তু অটল। তিনি ফুলারকে এক চিঠিতে জানালেন যে বাংলাদেশে শান্ত নিরুপদ্রব লোকের বাস তবে তারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আমার পরিবার রইলো পিছনে, অনেক স্বার্থত্যাগ আমায় করতে হবে। সংসারের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে—"I have many sacrifices to make. I must part with a beloved family, and a number of most affectionate friends."

কিন্তু যাবো বল্লেই যাওয়া যায় না। নানা জায়গা থেকে পয়সাকড়ি সংগ্রহের চেষ্টা হতে লাগলো। আসবাবপত্র কিছু কিছু বিক্রী হয়ে গেল। ডরোথি শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হলো, তবে তার একান্ত জিদ যে তার বোন ক্যাথারিনকে সঙ্গে নিতে হবে। খরচ বাড়তে লাগলো। পাগল টমাস তখন তার ঔদার্য দেখালো। সে নিজে ভৃত্য শ্রেণীর টিকিট কাটলো। ক্যাথারিনকে উৎসাহিত করলো ডরোথির সহচরী হতে। অর্থের প্রয়োজন কমলো অনেক। ১৭৯৩ খৃঃ ১৩ই জুন কেরী ও টমাস চল্লেন ভারতের অভিমুখে প্রিন্সেস মারিয়া জাহাজে।

ইতিপূর্বে বহু ইংরাজ ভারতবর্ষে এসেছেন সরকারী কাজে, যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে, পণ্যের বেচাকেনার জন্য কিন্তু প্রভু যীশুর ধর্মবাণী প্রচার করার জন্যে প্রথম এলেন কেরী আর টমাস। টমাসের মুখে তখন বাংলার খই ফুটছে—বোধ হয় কেরীর কাছে নিজের কৃতিত্ব জাহির করার একটা বাসনাও ছিল মনে। গোড়া থেকেই ধর্মপ্রচারের কাজে লাগলেন কেরী, সঙ্গে টমাস ও রামবসু। রামবসুর সঙ্গে কেরীর পরিচয় জাহাজ ঘাটেই। কেরী এইসময় কিছুদিন ব্যাণ্ডেলে বাস করেন। প্রচার সভায় তখনকার মতো টমাসই বক্তা। শ্রোতারা স্তব্ধ বিস্ময়ে সাহেবের মুখে বাংলা শুনতে লাগলো। কেরী তাকেই ধর্মভাষণ শোনার ঐকান্তিক বাসনা বলে মনে করলেন। তিনি

লক্ষ্য করলেন এখানকার লোকেরা কি গভীরভাবে ধর্মপ্রবণ। তাঁর মনে হলো 'Ten thousand ministers would find scope for their powers.'

কিছুদিন ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল থেকে নদীয়া, নদীয়া থেকে কলকাতা বেড়ালেন কেরী। কলকাতায় বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষপদ পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা পাননি। টমাস পাওনাদারদের থামাবার জন্যেই যেন ডাক্তারী করতে শুরু করলেন কলকাতায়। এই সময়ে তেজারতীর কারবারী নীলু দত্ত মাণিকতলার বাগানবাড়িতে থাকতে দিলেন কেরীকে সপরিবারে।

কি দারুণ কষ্ট ও অভাবের দিন গেছে কেরীর। টমাসের হাতে ছিল টাকাকড়ির ভার। হিসাব বস্তুটা টমাসের ধাতে সয়নি কখনো। টমাস জানালে টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে এসেছে। ডরোথি কেরী কঠিন রোগে আক্রান্ত, বড় ছেলে ফেলিক্স নদীয়া থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরলো, পণ্ডিতের মাইনে কুড়ি টাকা। ইংলণ্ড থেকে বছর খানেকের মধ্যে টাকা আসবার সম্ভাবনা নেই—কলকাতায় বারো টাকা সুদে টাকা ধার পাওয়া যায় তার কমে নয়।

কিন্তু এতো কেরীর মতো লোকের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। তিনি তো তৈরি হয়েই এসেছিলেন—ভগবানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। তাঁর দিনপঞ্জীতে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিন বার বার তিনি সকল দুঃখ কষ্টকে ভগবানের আশীর্বাদ মনে করেছেন। ২৩শে জানুয়ারী বলছেন—"Everything is known to God, and He cares for the Mission. I rejoice in having undertaken this work; and I shall, even if I lose my life their in."

ইতিমধ্যে রামরাম বসু সুন্দরবনের দেবহাট্টা অঞ্চলে কিছু পতিত জমি জোগাড় করলেন তাঁর এক জমিদার আত্মীয়ের কাছ থেকে। তিন দিন নৌকো করে সপুত্রপরিবার কেরী জলপথে চললেন, সঙ্গে

রাম বসু। দেবহাট্টায় নেমে দেখলেন বাংলো খালি নেই। জীবনে বোধহয় এমন হতাশা কেরী আর কখনো অনুভব করেন নি। বাঘ আর সাপে ভরা সুন্দরবনে থাকবার জায়গা না পেলে মৃত্যু অবধারিত। এমন সময় ঘাড়ে বন্দুক ঝুলিয়ে সঙ্গে কুকুর নিয়ে এক ইংরাজ পুরুষ এলেন বিধাতার আশীর্বাদের মতো। তিনি তাঁর বাড়িতে জায়গা দিলেন সকলকে। কোম্পানীর সল্ট এসিসটেণ্ট চার্লস সর্ট প্রভু যীশুর বিশেষ পরোয়া করতেন না। তবু এই করুণাটুকু না দেখালে বাংলায় মিশনারীদের সুদীর্ঘ ইতিহাস রচনার হয়তো আদৌ কোন প্রয়োজন হতো না। কেরীর সুন্দরবনে পৌঁছানোর তারিখ ৬ই ফেব্রুয়ারী।

বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কেরীর জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত জঙ্গলে কেরী বন সাফ করে চাষের জমি তৈরি করতে লাগলেন, নিজের বাড়ি তৈরি করবার চেষ্টা করলেন মাটি আর বাঁশ দিয়ে, নিজের গ্রাম্যজীবনযাপনের অভ্যস্ত অনুকূল পরিবেশ তিনি পেলেন এখানে। আত্মশক্তিতে বিশ্বস্ত কেরী শুধু নিজেই জঙ্গলবাসী হলেন না। বাঘের ভয়ে যারা পালিয়েছিল সেই সব গ্রামবাসীদের রাম বসু বোঝালে যে কেরী বাপের মত তাদের সঙ্গে থাকবে,—"he would be a father to them all." আনন্দিত কেরী জানাচ্ছেন যে প্রায় তিন চার হাজার গ্রামবাসী আবার আসছে ফিরে।

কিন্তু এমন সময় খবর এলো মালদহে একটি নীলকুঠির কর্তৃত্ব ভার পেয়েছে টমাস আর মদনাবাটির আর একটি কুঠির কর্তৃত্ব ভার দেওয়া হয়েছে কেরীকে। আবার বাঁধাছাঁদা শুরু হলো। ইতিমধ্যে কেরীর বাংলা শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। বাংলা শব্দকোষ আর ব্যাকরণের খসড়া তৈরি হয়ে গেছে। তিনি নিজেই লিখেছেন—"I see that it is a very copious language,

and abounding with beauties···. The hope of soon getting the language puts fresh life into my soul." ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে কেরী আবার নদীপথ ধরে চললেন—ইছামতী, জলঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা নদীর উপর দিয়ে নৌকো চলছে—পথে চাতুরিয়ায় কেরী প্রথম বাংলায় ধর্মপ্রচার করলেন। কিন্তু তখনো জনসভায় বক্তৃতা করার মতো অধিকার তাঁর জন্মায় নি। তিনিই নিজেই বল্লেন,—'কথা হারিয়ে যায়।'

মালদহের মদনাবাটির কুঠিতে নীলচাষের কাজ তদারক করার জন্য উডনী সাহেব কেরীর দুশো টাকা মাইনে ঠিক করে দিলেন। মানিকতলা আর দেবহাট্টার সদাশংকিত জীবনের দিনগুলি কেটে গেল। তিনি ইংলণ্ডে লিখলেন যে আর ভয় নেই। নিজের খরচ নিজেই চালাবো। ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল কেরীর। নিজের রোজনামচায় লিখেছেন,—"If after God had so wonderfully made way for us, I should be negligent, the blackest brand of infamy must lie upon my soul."

কিন্তু মদনাবাটিতে অল্পদিনের জ্বরে মারা গেল পাঁচ বছরের ছেলে পিটার। অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেরী। পিটারকে কবর দিতে গিয়ে হিন্দু বা মুসলমানের কাছে সাহায্য পেলেন না তিনি। জাতিচ্যুত দু'একজন লোক তাঁকে সাহায্য করে। ইতিমধ্যে নীলচাষীদের কাছে কেরীর সহৃদয়তার সুনাম হয়েছে। চাষীরা প্রথম প্রথম শত্রু মনে করলেও বুঝলো যে তাঁর কাছে তাদের ক্ষতির সম্ভাবনা কম। কর্মোপলক্ষে নানা জায়গায় তাঁকে যেতে হতো। খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে তিনি গাছপালা জীবজন্তু, মানুষ ও তার বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। এই সময়ে কৃষকদের কথা মনে রেখে তিনি মদনাবাটিতে স্কুল খুললেন। এই সব কর্মব্যস্ততার মধ্যেও মিশনের কাজ তিনি এক মুহূর্তের জন্তও ভুলে যাননি। বাংলাভাষা শেখবার

চেষ্টায় তাঁর একটুও শৈথিল্য ছিল না। ফুলারকে লিখেছেন "I may declare that, after a bare allowance for my family, my whole income goes for the purposes of gospel, in supporting pundits and school-teachers and the like···I am indeed poor, and always shall be till the Bible is published in Bengali and Hindusthani." জাতের গোঁড়ামি যে কতদূর গেছে তা তিনি লক্ষ্য করলেন। তিনি বুঝলেন যে দিনের পর দিন মদনাবাটিতে প্রভু যীশুর করুণা প্রচার করলেও তার বিন্দুমাত্র ছায়া পড়বেনা জনচিত্তে। উদাস দৃষ্টি মেলে তারা প্রতি রবিবার কেরীর প্রার্থনা শোনে—কিছু না জানবার না বোঝবার জন্যে তাদের মন তৈরি। কেরী হতাশ হয়ে তাদের সম্বন্ধে বলছেন 'harmless, indifferent, vacant.'

বাংলার শিক্ষা এগুতে লাগলো, বাইবেলের অনুবাদও হতে থাকলো রাম বসুর সাহায্যে, ইংলণ্ড থেকে প্রেস আনবারও চেষ্টা হতে লাগলো। বাংলায় নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ যখন বেশ এগিয়ে চলছিলো তখন হঠাৎ কেরী আবিষ্কার করলেন যে রাম বসুর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নয়। রাম বসু ছিলেন কেরীর প্রধান ভরসা। তাকেই প্রথম খৃষ্টান করে তুলবেন এই ছিল কেরীর সুনিশ্চিত ধারণা। এখানেও গভীর হতাশা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। রাম বসুর সাহায্য কেরীর একান্তই প্রয়োজন ছিল, শুধু তাই নয় লোকটির ছিল পাণ্ডিত্য। কেরী নিজেই বলেছেন রাম বসু সম্বন্ধে—"a scholar of the very best natural abilities and a faithful counselor.'

রাম বসুকে ছাড়িয়ে দিতে হলো। সঙ্গে সঙ্গে কেরীর পাঠশালার পণ্ডিতটিও পালালো, কাজকর্ম সবদিক থেকেই বন্ধ হওয়ায় কেরী আরও হতাশ হয়ে পড়লেন।

কিন্তু এই সময়ে মিশনের কাজে কেরীর সহকারী হয়ে এলেন জন ফাউনটেন আর ইগনেসিয়াস ফার্ণগুেজ। এঁদের সাহায্যে কেরী আবার নব উদ্যমে শুরু করলেন। স্কুল আবার খোলা হলো, কেরীর নিউ টেস্টামেণ্ট অনুবাদ আবার শুরু হলো। ফার্ণাগুেজ টাকা দিল ধর্মগ্রন্থ কেনবার জন্য। এমনি করে কেরী রামবসুর অভাব সত্ত্বেও কাজ চালাতে লাগলেন।

১৭৯৭ সালে কেরীর নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ শেষ হলো। তিনি এই সময়ে পূর্ণ উদ্যমে সংস্কৃত শিখতে মন দিয়েছেন। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছেন "New Testament is now translated in Bengali. Its treasure will be greater than diamonds." বাংলা টেস্টামেণ্ট রচনা হবার পরের সমস্যা—তার ছাপা। অনেক চিঠিপত্র লিখেও ইংলণ্ড থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। কেরী ঘুরে এলেন কলকাতায়। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল যে কলকাতায় টাইপ কাটিয়ে ছাপতে প্রচুর খরচ—সে খরচ মিশন দিতে পারবে না।

এমন সময় খবর এলো মাত্র চল্লিশ পাউণ্ডে একটি প্রেস বিক্রী হবে। মদনাবাটি কুঠিয়াল উডনী প্রেসটি কিনে দান করলেন মিশনের কাজে। ১৭৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেস এসে পৌঁছলো মদনাবাটিতে। কিন্তু হায় কেরীর জীবন যেন বাধার সম্মুখীন হওয়ার জন্যেই—ফসলের ক্ষতি হওয়ায় উডনী তাঁর মদনাবাটির কুঠি তুলে দিলেন। নিরুপায় কেরী চলে গেলেন মদনাবাটির কাছাকাছি এক গ্রামে—সেখানে নীলকুঠি কিনে প্রেস চালাবার বাসনায়।

১৭৯৯ সালের ১৩ই অক্টোবর মার্সম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও গ্রাণ্ট চারজন মিশনারী সপরিবারে শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিলেন। মিশনারীদের তখন সুনজরে দেখছেন না ইংরাজ সরকার। শ্রীরামপুর ডাচ অধিকৃত। ১লা ডিসেম্বর ওয়ার্ড কেরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কেরী পরিবার সম্পর্কে তিনি কিছু সংবাদ দিয়েছেন—

"মিসেস কেরী সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছেন। তাঁদের চারটি ছেলেই অনর্গল বাংলা বলে।" তিনি ইংলণ্ডে কেরীকে দেখেছিলেন, এবার দেখে লিখেছেন যে তাঁর তারুণ্য এখনো আছে—"a youngman still" ওয়ার্ডের কাছেই কেরী শুনলেন যে কোলব্রুক ও রক্সবার্গের অনুরোধ সত্বেও কেমন করে সরকার তাঁদের কোম্পানী এলাকা ছেড়ে যেতে বলেছে। শ্রীরামপুরের সত্তর বছরের বৃদ্ধ গভর্ণর বাই তাঁদের সাদর অভ্যর্থনায় ডেকে নিয়েছেন—স্কুল করার, মুদ্রাযন্ত্র বসানোর, অবাধ প্রচারের স্বাধীনতা দিয়েছেন।

নতুন কোন সম্পত্তির মোহ কেরীকে ধরে রাখতে পারলো না। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে তিনি ২৫শে ডিসেম্বর বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে নিলেন তাঁর সস্তাকেনা ছাপাখানা আর যুবক ফাউনটেনকে। টমাস ইতিপূর্বেই মহীপাল ছেড়ে চলে গেছেন। অস্থির চঞ্চলচিত্ত টমাস নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন —মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শিথিল হয়ে এসেছিল।

মদনাবাটির নিকটবর্তী গ্রাম খিদিরপুর থেকে শ্রীরামপুর—কী পরিবর্তন। বাংলাদেশের প্রাণস্রোত তখনই কলকাতাকে ঘিরে বইতে শুরু করেছে,—তার কত কাছে। নানা জাতের নানা ভাষার মানুষের সমাবেশ সেখানে। খিদিরপুর ছিল শান্ত পল্লী। শ্রীরামপুর হলো হুগলী জেলা—মাহেশের রথ প্রতিবছর জগন্নাথের জয়ধ্বনিতে আকাশ মুখর করে তোলে। হিন্দু সভ্যতার শক্ত ঘাঁটিতে পা দিলেন কেরী। ইতিপূর্বে শ্রীরামপুরে মিশন গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তাও তিনি জানেন।

ওয়ার্ড, ব্রান্সডন আর ফেলিক্স ছাপাখানার কাজ শুরু করলেন, খরচ মেটানোর প্রশ্ন দেখা দিল। মার্সম্যান বোর্ডিং স্কুল খুললেন —ধনী অভিজাত ইউরোপীয় পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়তে এলো —ছাত্রদের আনন্দোচ্ছ্বাসে শ্রীরামপুরের গঙ্গাতীর কোলাহলমুখর

হয়ে উঠলো—ওয়ার্ড, মার্সম্যানের মত সঙ্গী পেয়ে কেরী বুঝলেন এতদিনে মিশনের কাজের একটা ভিত্তি গড়ার সুযোগ এসেছে।

প্রেসের কাজ চলতে লাগলো। কোলব্রুকের কাছে ছিল উইলকিন্সের সহকারী পঞ্চানন। পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরে আনলেন, সঙ্গে এল তার আত্মীয় মনোহর। ১৮ই মার্চ ম্যাথু লিখিত সমাচারের প্রথম একটি পাতা ছাপার জন্য সাজানো হলো। কেরীর আনন্দের শেষ রইলো না। বাংলা ভাষায় প্রভু যীশুর বাণী প্রচারের স্বপ্ন তাঁর সফল হতে চললো। ওয়ার্ড বলছেন—"This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Matthew." সঙ্গে সঙ্গে বাইরের প্রচারের কাজও বেড়ে গেল। সভায় সভায় শ্রোতার সংখ্যা বাড়তে লাগলো। কেরী মনে মনে স্বপ্ন গড়তে লাগলেন যে সমস্ত কুসংস্কার ধুয়ে মুছে সাফ করে ভগবানের প্রেমের রাজ্য গড়ে তুলবেন। এমনি সময় আবার এলেন রাম বসু। তাঁকে ফিরে পেয়ে কেরী খুসী হলেন—পূর্ব অপরাধ বোধ হয় মনে রইলো না।

ওয়ার্ডের সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে যে ১৮০০ সালের অগস্ট মাসে ম্যাথু লিখিত বাণী 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' নামে প্রকাশ হলো। শ্রীরামপুর মিশনের এই রচনা মুলত টমাস ও রাম বসুর। জনৈক জীবনীকার বলেছেন "রামরাম বসু, টমাস ও কেরীর নাম একত্রে গ্রথিত করিয়া এই পুস্তকটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।' ইতিপূর্বে কেরী ও রাম বসুর খৃষ্ট-মহিমা প্রচারক গান শ্রীরামপুর মিশন থেকে ছাপা হয়। ভাষা নিয়ে কেরীকে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছিল—cross কথার বাংলা খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ cruz কথা চালিয়ে দিলেন। আজও বাংলায় তাই চলছে।

২৮শে ডিসেম্বর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম দেশীয় লোকের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের উৎসব করলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। প্রথম এগিয়ে এলেন

কৃষ্ণপাল। কেলিম্ব আর কৃষ্ণপালকে একই সঙ্গে একই মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন কেরী। দূরে দাঁড়িয়ে উন্মত্তপ্রায় জনতা ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর লাঞ্ছনা ছুঁড়তে লাগলো কৃষ্ণপালের প্রতি। কেরীর অভয় হস্তের সান্ত্বনা তাকে সাহস দিল। কদিন পরেই খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করলো রসময়ী কৃষ্ণর স্ত্রী। শ্রীরামপুর মিশন অন্ধকারে জ্বলা এই দুটি প্রদীপের আলোয় উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে চললো।

৫ই মার্চ ১৮০১ সাল বাংলা নিউটেস্টামেণ্ট ছাপা হয়ে বেরুলো। কেরীর মন তখন আনন্দে ভরপুর—মনে হলো সংস্কারের বটবৃক্ষে তিনি যেন জ্ঞানের কুঠার দিয়ে প্রথম আঘাত করলেন। নিউটেস্টা-মেণ্টের অনুবাদক স্বয়ং কেরী। ভাষায় কাঁচাহাতের ছাপ রইলো। তবু এই কাজের জন্যেই কেরীর এতদিনের যে ব্যগ্র উৎকণ্ঠা—তা শান্ত হলো।

কিন্তু নিউটেস্টামেণ্টের অনুবাদে খৃষ্টান ধর্মের দ্রুত বৃদ্ধি না হোক কেরীর পুরস্কার এলো অন্যরূপে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বাংলার অধ্যাপনার জন্য কেরীর কাছে আহ্বান এলো। ১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল সকালবেলায় কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড তিনজনে মিলে ঠিক করলেন "as it came unsought and might in easily-imagined circumstances be of essential service to the Mission"—তখন কেরীর কাজ নেওয়াই ভাল।

কাজে যোগ দিয়েই কেরীর প্রথম সমস্যা হলো ভালো পণ্ডিত জোগাড় করা যারা সহকারী হবে। রামরাম বসুর কথা মনে ছিল —তাঁর পূর্ব ইতিহাস মনে রেখেও কেরী তাঁকে সহকারী পণ্ডিতের পদ দিলেন। প্রধান পণ্ডিত করলেন অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারকে। নির্বাচনে কেরীর ভুল হয়নি, মৃত্যুঞ্জয় ও রাম বসুর বাংলা গদ্য রচনা তা প্রমাণ করছে। আরও দুজন পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে যোগ দিল।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো বাংলা পাঠ্য বইয়ের। বাংলা গদ্য বই নেই যা পড়ানো যায়। হ্যালহেডের ব্যাকরণ তখনই দুষ্প্রাপ্য। নিজে লাগলেন পথ খুঁড়তে, সঙ্গে ডেকে নিলেন পণ্ডিতদের। নিজে হাত দিলেন বাংলা ব্যাকরণ রচনায়, পণ্ডিতদের লাগালেন গদ্য গ্রন্থ রচনায়।

উইলিয়াম কেরীর অসাধ্যসাধন ক্ষমতার প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর গ্রন্থাবলী। ১৮০১ খৃষ্টাব্দেই তাঁর ব্যাকরণ প্রকাশিত হলো। তিনি নিজেই বলছেন যে হ্যালহেড তাঁর রচনার ভিত্তি যোগালেও অনেক নতুন কথা তিনি বলেছেন। এই ব্যাকরণেরই এক পরবর্তী সংস্করণে কেরী বাংলাভাষার প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করে বলেছেন "Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the South, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan···may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India···it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the east."

ব্যাকরণ প্রকাশ হতে হতেই কেরী তাঁর 'কথোপকথনে' হাত লাগালেন। তিনি জানতেন চলতি ভাষার খুঁটিনাটি না জানলে ভাষার জ্ঞান পুঁথিগত বিদ্যার সীমা পেরুবেনা। তাই কথোপকথন রচনা। বাংলা সাহিত্যে যে সজীব সন্ধানী মন নিয়ে কেরী কাজে নেমেছিলেন তারই ফসল কথোপকথন। একাজে তিনি যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সাহায্য পেয়েছিলেন তা-ও মনে রাখা প্রয়োজন। উইলসন সাহেব এই বইটির সম্বন্ধে বলেছিলেন 'a lively picture of the manners and notions of the people of Bengal.

ক্রমে ক্রমে বাংলা, সংস্কৃত, মারাঠি পড়াবার দায়িত্বও কেরীর উপর এসে পড়লো। সমুদ্রে সন্তানবিসর্জন দেওয়ার হিন্দু প্রথা সম্বন্ধে তদন্তের ভার তাঁর উপরেই দিলেন ওয়েলেস্‌লী। সতীদাহ সম্বন্ধেও নিজের উৎসাহেই তিনি তদন্ত করতে লাগলেন। বাংলাদেশের জীবনের সঙ্গে কেরী তখন জড়িয়ে পড়েছেন।

কলেজে একসময়ে বাংলা ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কমে যেতে লাগলো। কেরীর উৎসাহে তা আবার বাড়তে আরম্ভ করলো। ছাত্রদের কাছে নবীন উদ্যমে তিনি বাংলাভাষার গৌরব প্রচার করতে লাগলেন—"convinced as I am that the Bengali is intrinsically superior to all other spoken Indian Languages and second in utility to none."

বাংলা গদ্যসাহিত্যের যাত্রাপথের সূচনায় যিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা নবীন আশা ও আনন্দের সূচনা করেছিলেন তিনি উইলিয়ম কেরী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের অবিশ্রান্ত আসা যাওয়ায় তাঁর ঘর তখন প্রাণচঞ্চল। তিনি বসেছেন সকল নূতন কর্ম্মের কেন্দ্রে অফুরন্ত উৎসাহ সঞ্চার করে। প্রতি বছর নতুন নতুন বই প্রকাশিত হতে লাগলো—বেশির ভাগই অনুবাদ, বাংলা গদ্যের গোড়া তখন শক্ত হয়ে উঠছে। এক এক সময় মনে হয় প্রভু যীশুর বাণী প্রচারের চেয়ে এই সময়ে যেন বাংলাগদ্যভাষা গঠনেই তাঁর বেশি সময় কেটেছে, মন বেশি ব্যস্ত হয়েছে। এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ এই সময়েই—১৮০৬ সালে।

ইতিমধ্যে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর হাতেই ছাপা হলো কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত। সেই ছাপার ওপরেই কলম চালিয়ে তাকে শুদ্ধ করে নেন পরবর্তী পণ্ডিতেরা। "বর্ত্তমানে আমরা বাজারে যে সকল রামায়ণ মহাভারতের সংস্করণ দেখি তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আদর্শে মুদ্রিত।"

অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্যে কেরীর দিন কাটতে লাগলো। কলেজের কাজ, বাংলা রচনার কাজ, মিশনের কাজ ও নিজের পড়ায় সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত সময় কোথা দিয়ে যে চলে যেত বুঝতেই পারতেন না। বিস্মিত মৃত্যুঞ্জয় ওয়ার্ডকে প্রশ্ন করে 'কেরী সাহেবের দেহটা কি দিয়ে গড়া বলোতো—আমি তো বুঝতেই পারি না, খিদেও পায় না ক্লান্তও হয় না, একটা কাজ ধরলে শেষ না করে ছাড়ে না।'

বাইরের জীবনের নানা কাজে ব্যস্ত হয়েও কেরী সস্নেহ পরিচর্যা করে এসেছেন অর্ধোন্মাদ ডরোথির। বেশ কিছুকাল ডরোথি একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। ১৮০৭ সালে তাঁর মৃত্যু হলো ৮ই ডিসেম্বরে। কেরী শান্ত সংযতভাবে এই দুঃখকে স্বীকার করলেন। অসুস্থ মস্তিষ্ক স্ত্রীর প্রতি তাঁর অনাদর একদিনের জন্যও দেখা যায়নি।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কেরীর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা লালবাজার চ্যাপেলের প্রতিষ্ঠা। এই বছরেই তিনি কলকাতায় একটি বাড়ি নিয়ে চলে এলেন। ১২ই মার্চ সকালবেলা কেরীর কাছে এক দারুণ দুর্যোগের খবর বহন করে আনলেন মার্সম্যান। শ্রীরামপুরের প্রেস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিছু পুঁথিপত্র বেঁচেছে বটে কিন্তু আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কি করে আগুন লাগলো সে প্রশ্ন আর তোলা নিরর্থক। শুধু শেষ সত্য হলো এই যে সবই গেছে। এই সব শুনেও কেরী বিচলিত হলেন না—কিছুদিন পরে লিখছেন—I wish to be still and know that the Lord is God, and to bow to His will is everything.

১৮১২ খৃষ্টাব্দে কেরীর ইতিহাস মালা প্রকাশিত হয়েছিল। নানা ধরনের গল্পের সমাবেশ এই গ্রন্থটিতে। ঐ অগ্নিকাণ্ডেই ইতিহাস মালার বহু কপি পুড়ে গেল। এ গ্রন্থ পাঠ্য হিসাবে তাই চললো না ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে।

১৮১৫ থেকে ১৮২৫—এই দশ বছর ধরে কেরীর বিরাট বাংলা ইংরাজী অভিধান ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে লাগলো খণ্ডে খণ্ডে। যে বিরাট কীর্তি কেরী এই গ্রন্থের দ্বারা অর্জন করলেন তা তাঁকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। পরবর্তীকালে বহু গবেষক এই গ্রন্থের ভিত্তিতেই অভিধান প্রকাশের চেষ্টা করেছেন।

১৮৩১ সাল পর্যন্ত কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। নানা ভাষা আয়ত্ত করে, বিবিধ গ্রন্থ রচনা করে শ্রীরামপুরে বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করে, সর্বোপরি বাংলাগদ্যের প্রত্যুষ কালের সূচনা করে কেরীর জীবন বিবিধ ঘটনার বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল। তাঁর বাল্যকালের প্রণয়িণী উদ্ভিদবিদ্যা তাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছে, ভারতীয় কৃষিবিদ্যাও তাঁর সম্পূর্ণ অজানা ছিল না। কুষ্ঠরোগীদের জন্য বিশেষ সহানুভূতি তাঁর উদার হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। কলকাতায় তিনি কুষ্ঠাশ্রমও একটি গড়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার সবিশেষ উল্লেখ তাঁর অন্যান্য কর্মের যথেষ্ট পরিচয় দানের স্থান সংকুচিত করেছে।

বৃদ্ধবয়সেও কেরীর আঘাত কিছু কমেনি। নানাদিক থেকে বিরুদ্ধতা এসেছে। স্থির শান্ত মনে ওয়ার্ড আর মার্শম্যানের মত সঙ্গীদের নিয়ে তিনি নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। হাস্যোদ্দীপ্ত মুখে সকলের কাছে যখন তিনি কাজের দাবি নিয়ে আসতেন তখন তাঁরই আদর্শ সকলকে কাজের উৎসাহ দিত। নিজেই বলতেন 'জীবনে কোন ইচ্ছা আমার অপূর্ণ নেই।' ডরোথির মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন শার্লটকে। শার্লটের মৃত্যু হয় ১৮২১এ। তাঁর তৃতীয় পত্নী তাঁর মৃত্যুর পরও বেঁচেছিলেন।

১৮৩৪ সালের ৯ই জুন কেরীর শ্রান্ত দেহের প্রদীপ যখন স্তিমিত হয়ে এলো তখন পাশে এসে বসলেন তাঁর সুদীর্ঘকালের বন্ধু, সঙ্গী, অনুচর মার্শম্যান। নতজানু মার্শম্যান প্রার্থনা করলেন—প্রভু যীশুর

কাছে এই তরঙ্গতাড়িত মথিতহৃদয় বিরাট কর্মী পুরুষের জন্য শান্তির আশ্রয়। পাশে দাঁড়িয়ে মিসেস কেরী প্রশ্ন করলেন 'তুমি কি বুঝতে পারছো তোমার সঙ্গে কে প্রার্থনা করছে।' কোন সুদূরলোক থেকে যেন উত্তর এল 'হ্যাঁ পারছি।' শিথিল পীড়নের ভাষা তাঁর হাতের উপর অনুভব করতে পারলেন মার্শম্যান। কেরী বলে গিয়েছিলেন যে তাঁর কবরের পাশে শার্লটের কবরে যেন শুধু দুটি লাইন জুড়ে দেওয়া হয়—

A wretched, poor and helpless worm
On thy kind arms I fall.

তাঁর জন্য আলাদা করে কোন স্মৃতিফলক তৈরি হয়নি। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন সারা জীবন, নামের মোহ ছিল না কখনো।

তাঁর জনৈক জীবনীকার তাঁর মৃত্যু বর্ণনার পর রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে কয়েকটি লাইন তুলেছেন—

"I shall put on my wedding garland. Mine is not the red brown dress of the traveller, and though there are dangers on the way, I have no fear."

কোলব্রুক

হেনরী টমাস কোলব্রুক আটপৌরে ঘরের সন্তান ছিলেন না। অভিজাত কাঞ্চনকৌলীন্যগর্বী বংশের সপ্তম সন্তান তিনি। তাঁর পিতা স্যার জর্জ কোলব্রুক সুদীর্ঘকাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তাঁর জন্ম।

প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ হেনরী টমাস কোলব্রুকের বাল্যজীবনের সংবাদ কেউ রাখেনি। তাঁর বাল্যজীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যার মধ্যে তাঁর উত্তরকালের কর্মচঞ্চল প্রতিভাদীপ্ত জীবনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়—আর বোধ হয় সেই কারণেই তাঁর বাল্যজীবনের কোন বিবরণ পরেও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। শুধু জানা গেছে বালকজীবনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা তাঁর কিছুমাত্র ছিল না। মনে মনে ইচ্ছা ছিল পাদ্রী হবার, ভবিষ্যৎ জীবন কোন গীর্জার প্রশস্ত কিন্তু শান্ত আঙ্গিনায় কাটিয়ে দেবার। ইংলণ্ডের কোন স্কুলের পুরানো খাতায় তাঁর নাম পাওয়া যাবে না—কারণ কোন স্কুলেই তিনি পড়েন নি। বাড়িতে শিক্ষক আসতো—তাঁরই নির্দেশে বালক কোলব্রুক নিজের পড়া নিজেই চালিয়ে যেতেন। বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে যতটা বিদ্যায় অধিকার নিয়ে ছাত্ররা জীবনে প্রবেশ করে, ততটা বিদ্যা পনেরো বছর বয়সেই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। গ্রীক ও রোমান ক্লাসিক তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল, গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেন অঙ্কশাস্ত্রে, ফরাসী ও জার্মান ভাষা তখন তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে।

বারো বছর থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর ফরাসী দেশে কেটেছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে কোম্পানীর অধীনে রাইটারশিপের কাজ পেলেন তিনি। জাহাজ বন্দরে এক আশ্চর্য দুর্ঘটনা তাঁর জীবনের প্রথম বিষণ্ণ অভিজ্ঞতা। তাঁর চোখের সামনে তিনি

ডুবে যেতে দেখলেন একটি বিরাট জাহাজ—রয়েল জর্জ। মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বিরাট সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জনের মধ্যে রয়েল জর্জ তলিয়ে গেল। জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন। বুঝলেন নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিন্ততার স্রোতে দিন কাটবে না। দীর্ঘকাল সমুদ্রবাসের পর ১৭৮৩ খৃঃ-এ এপ্রিল মাসে তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না ভারতবর্ষের প্রতি—যে প্রাচ্যবিদ্যাগবেষণায় তাঁর জীবনের চরম সার্থকতা সেই প্রাচ্যবিদ্যার বিন্দুমাত্র সংবাদও তিনি রাখতেন না।

আসামাত্রই তাঁকে কাজে লাগতে হলো না—যে কোন কারণেই হোক কিছুদিন বিনা কাজে কাটলো। তাঁর বড় ভাই এডওয়ার্ড কোলব্রুক তখন কলকাতায় থাকেন। সেইখানেই শুয়ে বসে আলস্যে দিন কাটাতে লাগলেন। কিছুদিন পরে বোর্ড অফ একাউণ্টসে একটি সামান্য কাজ তাঁকে দেওয়া হলো। ভাষা শিক্ষা বা জনসাধারণের জীবনযাপন সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য তাঁর দেখা গেল না। পিতা স্যার জর্জ প্রত্যেক চিঠিতেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা তথ্য জানতে চেয়েছেন, নানা ভাষা শিখতে পুত্রকে উৎসাহ দিয়েছেন। হিন্দুস্থানী ভাষার তখনও কোন বাঁধা হরফ নেই, সুতরাং সে ভাষা শিক্ষার উৎসাহ হলো না তাঁর। আর পারসী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এই যে ঐ ভাষার ব্যবহার নেই অতএব তা শি'খই বা লাভ কি? —"Persian is too dry to entice and is so seldom of use that I seek its acquisition very leisurely." মন পড়ে আছে তখনো গ্রীক ও রোমান ক্লাসিকে। বাড়িতে চিঠি লিখছেন—গ্রীক ও রোমান ক্লাসিক পাঠিয়ে দাও কিছু।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের জীবনে একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘনিয়ে আসছিল। এতকাল কেবল বাবুয়ানি করে, দাপট দেখিয়ে নিম্নতন কর্মচারীদের গাধার মত খাটিয়ে তারা সুখে দিন

যাপন করেছে। এই সময় কোম্পানীর শাসন কোম্পানীর কর্মচারীদের উপরেই প্রবল হতে লাগলো। ত্রাহি ত্রাহি রব পড়লো কর্মচারীদের মধ্যে। কোলব্রুকের প্রথম দিককার চিঠিগুলির মধ্যে সেই অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। স্বভাবতঃই কোম্পানীর কিছু অলস কর্মী তাঁকে এই কথা বুঝিয়েছিল যে এই কাজে শুধু দায়িত্ব আছে পরিশ্রম আছে, পুরস্কার নেই। বিরক্ত চিত্তে পিতার কাছে লিখছেন যে এর চেয়ে বরং আমেরিকা যাওয়া ভাল ছিল। ঐ অসৎ কর্মচারীদের দ্বারা তিনি এতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাদের ঘুষ নেওয়াকেও প্রকারান্তরে সমর্থন করেছিলেন। পিটের ইস্ট ইণ্ডিয়া বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি লিখেছেন - "The numerous Collectors with their assistants had hitherto enjoyed very moderate allowances from these employers and which could not be made an object of reform but to these they were able to add some profits which were in no respect detrimental to their masters and which being both known and avowed could not be reckoned dishonest. Presents of ceremomy, called nuzzers, were to many a great portion of their subsistence." তিনি নিজে এই সময় এক বছরে ছশো ষাট টাকা মাইনে পেয়েছিলেন। কোলব্রুকের পরবর্তী কার্যকলাপ প্রমাণ করছে যে তিনি সৎ এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলেন। এই ধরনের অর্থোপার্জনের পদ্ধতির সমর্থন তিনি খুব সম্ভবতঃ ভ্রান্ত ধারণা থেকেই করেছিলেন। কোম্পানীর চাকরীতে নানারকম গোলযোগ দেখা দিতো। প্রবীণ কর্মচারীদের ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে যেতো সুযোগ-সন্ধানী খোসামুদে অধঃস্তন কর্মচারীরা। এ অবিচার নিবারণের কোন উপায় ছিল না। যদি কেউ নিজের দাবীর যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টা করতো তবে চাকরী চলে যাবার সম্ভাবনাও দেখা দিতে

পারতো। কোলব্রুক লিখেছেন—"However on a gentleman's endeavouring to enforce his claim by strenuous argument he was told that his spirited conduct might cost him the service." কোম্পানীর নানাধরনের অবস্থা তাঁর মানসিক বিভ্রান্তির কারণ হয়েছিল। আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখলেন যে ভারতবর্ষ আর সোনার খনি নেই, যে পারছে পালাচ্ছে। এসবই নিরাশ, ব্যর্থতায় অবসন্ন কোম্পানী কর্মচারীদের কথার প্রতিধ্বনি তাতে ভুল নেই। কারণ ইতিমধ্যে তাঁকে আর একটি কাজ দেওয়া হলো—with fixed duties and adequate allowances. গভীর ঐকান্তিকতার সঙ্গে কাজে মনোনিবেশ করে তিনি দেখলেন যে এতদিন তিনি সেই কর্মচারীদের কথাতেই চলেছেন যারা কাজে ফাঁকি দিয়েছে আর সাধ্যাতীত ব্যয় করে দেনাগ্রস্ত হয়েছে। তিনি নিজেই লিখেছেন—"I have at length become sensible of the absurd habit into which I had inadvertantly fallen of uttering groundless and exaggerated complaints against the country and my situation in it." দূরত্ব ছাড়া আর কোন অভিযোগ তাঁর রইলো না।

তিন বছর কলকাতায় থাকার পর তিনি কলেক্টর অফ রেভিনিউসের সহকারী হয়ে ত্রিহুতে চলে গেলেন। সেখানে কাটলো ন'বছর। কাজের চাপ ছিলো অনেক। তার মধ্যে মধ্যে আরবী ভাষা শিখতে লাগলেন। ধৈর্য ধরে পড়লেন ইসলামী আইন। এখানেই তিনি লক্ষ করলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুদের আশ্চর্য নৈপুণ্য।

এই সময় তাঁর প্রবল উৎসাহ দেখা গেল শিকারে। জীবনের শেষ দিকেও তাঁর এ উৎসাহ স্তিমিত হয়নি। অব্যর্থ লক্ষের গর্ব প্রায়ই তাঁকে করতে শোনা যেত। পড়াশুনার চেয়ে ঝোঁকটা ঐদিকেই বেশী ছিল। এই সময়কার একটি অমূল্য চিঠি তাঁর পাওয়া গেছে—পিতার

উদ্দেশ্যে লেখা ১৭৮৮ সালের ২৮শে জুলাই তারিখের। তাতে চার্লস উইলকিন্সের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ আছে, ভারতবাসী ইংরাজদের দুর্ব্যবহারের উল্লেখ আছে হেষ্টিংস ও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ আছে। শেষ অংশে কোলব্রুক বলছেন—"Although the conduct of the English in Hindusthan has been misrepresented and the crimes of a few exaggerated and received as a specimen of the characters of the whole, yet the treatment of the people has been such as will make them remember the yoke as the heaviest that ever conquerors put upon the neck of conquered nations."

১৭৮৯ সালে তিনি আরও উচ্চপদে উন্নীত হয়ে ত্রিহুত থেকে পূর্ণিয়া চলে গেলেন। উপরওয়ালা ছিল ফুর্তিবাজ লোক, কাজকর্মে ফাঁকি দেওয়াই ছিল তার স্বভাব। রিপোর্ট লিখতেন কোলব্রুক তিনি করতেন সই। কোলব্রুকও এ সুযোগ ছাড়লেন না। অগাধ পরিশ্রমে শুধু কর্তব্য পালনের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন কর্তৃপক্ষের। সমস্ত পূর্ণিয়া জেলার রাজস্ব নির্ধারণের ও রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় সন্ধানের দায় পড়লো তাঁর উপর। অফুরন্ত আশা আর উদ্যমে সঞ্জীবিত এই কোলব্রুকের সঙ্গে সদ্যআগত হতাশ কোলব্রুকের কি পার্থক্য। বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্যের নানা তথ্য তিনি সংগ্রহ করলেন। তখনকার এক চিঠিতে লিখছেন যে কোন একটা বিষয় নিয়ে তাঁর লেখার ইচ্ছা আছে—এবং বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয়নি, সুতরাং ঐ বিষয়েই লেখা যাবে—"One subject I believe is yet untouched ; the agriculture of Bengal. On this I have been curious of information, and having obtained some, I am now pursuing inquiries with some degree of regularity."

প্রথম দশ বছর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন ঔৎসুক্যই জাগে নি। তাঁর পিতা প্রত্যেক চিঠিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাতথ্য জানতে চেয়েছেন আর তিনি ক্রমাগত অতিরিক্ত কাজের অজুহাতে এড়িয়ে গেছেন। একজন শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের এই ব্যবহার আমাদের বিস্মিত করে।

ভারতবাসের একাদশ বর্ষে হঠাৎ তাঁর পাঠ্যবস্তুর মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল। গণিতশাস্ত্রে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। সেই গণিতের কোন কোন তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন কিছু সংস্কৃত আলোচনাও দরকার। পরবর্তীকালে সংস্কৃত থেকে কিছু কিছু গাণিতিক তত্ত্ব তিনি অনুবাদও করেছিলেন। সংস্কৃতের জটিল ব্যাকরণের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে তিনি দুবার ফিরেছিলেন। পূর্ণিয়াতেই সংস্কৃত চর্চার শুরু করেন কিন্তু ভালো করে অধ্যয়ন করার মত মানসিক অবস্থা হলো যখন তিনি নাটোরে। সংস্কৃত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এসিয়াটিক রিসার্চ কাগজখানাও উৎসাহ সহকারে পড়তে লাগলেন। সংস্কৃতের মধ্যে যখন একটু গভীরভাবে প্রবেশ করলেন তখন ভারতবর্ষ ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে ধারণা বদলে গেল। তিনি অনুভব করলেন ভারতবর্ষই আদি সভ্যতার ক্রীড়াভূমি—"The Hindu is the most ancient nation of which we have valuable remains, and has been surpassed by none in refinement and civilisation."—এই লেখার সঙ্গে সঙ্গেই জানালেন যে সংস্কৃত পড়ার আরও কিছু সময় পেলে খুশী হতেন।

নাটোরের জীবন কোলব্রুকের ইতিহাসে নিষ্ফলা নয়। নিজে স্বাধীনভাবে কিছু লেখবার চেষ্টা ইতিপূর্বেই তিনি করেছিলেন, সে কথা পরে বলছি। কিন্তু প্রথম প্রকাশিত লেখা নাটোরেই লিখেছিলেন। সে লেখার বিষয়বস্তু ছিল হিন্দুবিধবাদের সহমরণ।

লেখাটি তিনি পাঠালেন এসিয়াটিক সোসাইটিকে, পত্রোত্তরে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। উৎসাহ বেড়ে গেল কোলব্রুকের—সংস্কৃতভাষা ও প্রাচ্যবিদ্যায় মন লাগলো। পিতাকে জানাচ্ছেন চিঠিতে—"I am now fairly entered among oriental researches and may probably unless I be early removed to an office of more labour, pursue Sanskrit inquiries diligently and load the press with the result of my lacubrations." এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে পরিচয় হতে না হতে কোলব্রুকের হিতৈষী উৎসাহদাতা জোন্সের মৃত্যু হলো। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন প্রত্যেকটি লোক সেদিন বাংলা দেশে জোন্সের মৃত্যুকে নিজের আত্মীয়বিয়োগ বলে মনে করেছিল। কোলব্রুকও লিখেছিলেন যে সুদীর্ঘকালের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার এতবড় কর্মী ও পরিচালক আর হয়তো আসবেন না।

মৃত্যুর সময় জোন্স হিন্দু আইনের অনুবাদকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। সে কাজ অসমাপ্ত রইলো। কর্তৃপক্ষ এই কাজ সমাপ্ত করার জন্য লোক খুঁজতে লাগলেন। উৎসাহভরে এগিয়ে এলেন কোলব্রুক। প্রথমে বিনা পারিশ্রমিকে ছ'মাসের মধ্যেই কাজ সমাপ্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কলকাতার কর্তৃপক্ষ বল্লেন একটি নির্দিষ্ট বেতনে কলকাতায় থেকে কাজ করতে। কোলব্রুক রাজী হলেন না। তখন ঠিক হলো অবকাশ সময়ে তিনি যতটুকু পারবেন কাজ করবেন—ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেবার জন্যে অন্য লোক খোঁজা চলতে থাকবে। তারপর গভীর উদ্যমে কাজে লাগলেন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত অমানুষিক পরিশ্রম চলতে লাগলো। আত্মীয়স্বজন চিন্তিত হলো, উদ্বিগ্ন হলো বন্ধুজনেরা। দাদা এডোয়ার্ড কোলব্রুক এই সময় এসেছিলেন নাটোরে। তিনি দেখতেন মধ্য রাত্রে ঘুম থেকে উঠে যে তখনো কোলব্রুক কাজ করে চলেছেন। কতদিন টেনে

এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন. কিংবা অকস্মাৎ আলো নিভিয়ে দিয়েছেন।

এই সময় বিচার বিভাগের একটি কাজ নিয়ে তিনি বদলী হয়ে গেলেন মির্জাপুরে। নিকটেই পুণ্যতীর্থ বারাণসী যে হিন্দু পণ্ডিতদের মিলনকেন্দ্র তা তিনি জানতেন। মনে মনে খুসী হলেন। এই সময় তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। পূর্ণিয়ায় থাকতে কৃষি ব্যবস্থা ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সংগৃহীত তথ্য অবলম্বনে তিনি লিখলেন—"Remarks on the Husbandry and Commerce of Bengal." গভীরভাবে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেও কোলব্রুক গ্রন্থকীট ছিলেন না। যে দেশে থাকতেন সে দেশকে জানবার চেষ্টা করতেন। দু'চোখ মেলে দেখতেন জীবনকে—মীর্জাপুর তখন ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। কোলব্রুক এই শহরের প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব করতেন। মীর্জাপুর যে তাঁর ভাল লেগেছিল একথা তিনি নিজেই বলেছেন।

১৭৯৭ সালে ৩রা জানুয়ারী তিনি ঘোষণা করলেন যে হিন্দুআইনের সার সংকলনের যে দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ভাবে পালন করেছেন—"The task of translating the digest of Indian Law on which I have been so long employed, is now completed ; last week I sent it to the Governor-general." অনেকের ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মণেরা সাহেবদের সংস্কৃত শেখায় না—কারণ তারা হিন্দু নয়। কোলব্রুক এই হিন্দুআইনের সার-সংকলনের কাজ করতে গিয়ে দেখলেন যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহায়তা ছাড়া তাঁর এক পা চলার উপায় নেই। তিনি খুব জোর দিয়েই ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছেন—"I cannot conceive how it came to be ever asserted that the Brahmans were averse to instruct strangers ; several gentlemen who have studied the language, find as I do, the greatest readiness in them to give us access

to all their sciences. They do not even conceal from us the most sacred texts of their Vedas."

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এর আগেও হিন্দু আইনের সার সংকলনের চেষ্টা হয়েছিল। হেষ্টিংসের সময় সংস্কৃত থেকে পারসী এবং পরে পারসী থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন হ্যালহেড। সে কাজের অসম্পূর্ণতা লক্ষ করে জোন্স ঐ কাজে আবার হাত দিয়েছিলেন। জোন্সের নিজের পরিকল্পনার মধ্যেও কিছু ত্রুটি ছিল। কোলব্রুক একটি নতুন পরিকল্পনায় কাজ করলেন যাতে ঐ ত্রুটিগুলি আর চোখে না পড়ে। তার জন্যে তাঁকে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হলো। এরই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে সংস্কৃত চর্চা চলতে লাগলো। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কাজে উন্নতি হলো আরও। গেলেন নাগপুরে। সেখানে কাজ যত তার চেয়ে ঢের বেশী অবকাশ। প্রথমদিকে ভারতবর্ষে যে সময় নষ্ট করেছেন তার জন্য খেদ ছিল মনে। এখন প্রচুর সময় পেলেন। লিখছেন তাঁর মাকে—"I now embrace the opportunity of such leisure as my duties leave me to make amends for former indolence. নাগপুরের কাছাকাছি শিকারের ক্ষেত্র নেই—সেটা তাঁর দুঃখের কারণ হয়েছিল। মীর্জাপুর থেকে নাগপুর যাওয়া সেদিন আজকের মত সহজ ছিল না। পাহাড় পর্বত, নদী নালা পার হয়ে, কখনো পথচিহ্নহীন জঙ্গল ভেঙ্গে যেতে হয়েছিল। বিচিত্র প্রকৃতি ভারতবর্ষকে দেখবার এই সুযোগ তিনি নষ্ট করলেন না। ১৮০৬ সালের এসিয়াটিক এন্যুয়েল রেজিস্টারে এই পথচলার অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরও নিবিড় হয়েছে—সোসাইটির জার্ণালে বিবাহরীতি, সংস্কৃত ছন্দ এবং বেদ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে গাছপালাও তাঁর আলোচনার সীমা বহির্ভূত ছিল না।

এই সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নতুন সুযোগ এনে দিল কোলব্রুকের জীবনে। তখনকারদিনে প্রাচ্যবিদ্যাগবেষণার যথার্থ কেন্দ্র ছিল কলকাতা। কলকাতায় আসবার সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কলকাতায় এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ খোলা হয়েছে, কোর্ট অফ আপীল বসানো হয়েছে। কানাঘুষোয় শোনা গেল যে কলেজে কোলব্রুক কাজ পেতে পারেন এবং আদালতে বিচারক হতে পারেন। এ খবর তিনিও পেলেন। মনের আনন্দে জানালেন—"It is reported that I am to be nominated a member of the new court and a professor in the new college. Should this happen I shall be fixed at Calcutta which is exactly what I now wish for,"

ভাগ্যদেবতার প্রসন্নতাই বলতে হবে আপীল আদালতের বিচারপতি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক দুটো পদই তিনি পেলেন। মনের মত জায়গা, মনের মত কাজ পেয়ে নবীন উৎসাহে কাজে লাগলেন তিনি। সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ নিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় মন দিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে তিনি ভালবেসে ছিলেন। এ কলেজকে শুধু সিভিলিয়ানদের শিক্ষা দেবার কেন্দ্র না করে এর মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অগ্রগতি তিনি কামনা করেছিলেন। তার ব্যাকরণ শেষ হলো, প্রকাশিত হলো ১৮০৫ সালে। সেই সময় আরও দুজন বিদেশী গবেষকের সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হলো—একটি উইলিয়ম কেরীর আর একটি চার্লস উইলকিন্সের। ফলে কোলব্রুকের ব্যাকরণের বিশেষ প্রচার হয়নি। তিনি তার জন্যে বিশেষ চেষ্টাও করেন নি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা উল্লেখ করার মত—"The institution has already given occasion to many valuable publications on the oriental languages and literature······.

It has been well remarked that it has called forth greater exertion of intellect in a shorter period than has ever before witnessed in a similar walk of science."

প্রতিদিন পঠনপাঠনের পরিধি বেড়ে চলতে লাগলো। বৌদ্ধধর্মের প্রতি মন আকৃষ্ট হলো। বৌদ্ধধর্মের প্রসার যে এক সময়ে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের প্রসারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে কথা জেনে তাঁর বিস্ময়ের শেষ রইলো না। এতদিন জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল চাকরীর ক্রমোন্নতি। দশ হাজার মাইল পার হয়ে ভারতবর্ষে তো সেইজন্যেই আসা। কিন্তু কলকাতায় এসে কলেজে কাজ নিয়ে তাঁর মনের ধারাই বদলে গেল। যে বিরাট ঐশ্বর্য ভাণ্ডার খুলে গেলো তাঁর সামনে তার তুলনায় চাকরীর উন্নতি কত তুচ্ছ বোধ হলো তা নিজেই বলেছেন—"To speak truly I have had a sufficient peep behind the curtain within a few years past to know the hollow ground I should tread on, if raised to the highest station." চাকুরীজীবী কোলব্রুক ভাগ্যসন্ধান করতে এসে যে পথ পেলেন তা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিল। কিন্তু অফিসের কাজে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর শৈথিল্য দেখা যায় নি। সেখানে তিনি খাঁটি ইংরাজ—কর্তব্যে ত্রুটি তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হলেন। যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন ততদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে যাঁরা সাহিত্যচর্চার বিলাস করেন তিনি তাঁদের দলের নন। শুধু তিনি কেন—জোন্স, প্রিন্সেপ, উইলকিন্স সকলেই সরকারী কাজের অবকাশেই কাজ করেছেন। চাকরীর কালো মেঘ তাঁদের চিত্তাকাশের স্বাভাবিক দীপ্তিকে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে নি। সরকারী চাকরীর সমস্ত ঝামেলা ঘাড়ে নিয়ে, সভাসমিতির কাজ সেরে ফাঁকে ফাঁকে প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার কাজ

করেছেন তিনি। গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাই বলেছিলেন,—"My literary reputation will I hope be sufficiently established by my labours as an orientalist"

শুধু পরিশ্রমই নয়, তাঁর মানসিক বৃত্তির প্রখর তীক্ষ্ণতার কথা ভুলে গেলে তাঁর প্রতি আমরা অবিচার করবো। কঠিন বিষয় অনুধাবন করবার ও তাকে পুনর্ব্যাখ্যা করবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর পুত্র পিতার সম্বন্ধে বলেছেন—"It is not to his having laboured so long but to his having laboured so well, that he owes his reputation."

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক রিসার্চেস্-এর অষ্টমখণ্ডে বেদ সম্বন্ধে তাঁর রচনা প্রকাশিত হলো। বেদ নিয়ে কোন সুবিস্তৃত আলোচনা কোন বিদেশীর পক্ষে এই প্রথম। রিসার্চেসের নবম খণ্ডে বৌদ্ধ ও জৈনদের সম্বন্ধে তাঁর বহু যত্নে লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হলো হিন্দুদের জ্যোতিষ বিজ্ঞানের আলোচনা। হিন্দুদের জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে কোলব্রুকের জ্ঞান যে তাঁকে বিশেষজ্ঞের সম্মান দিয়েছিল সে সম্বন্ধে স্বয়ং হোরেস হেম্যান উইলসন সাক্ষ্য দিয়েছেন।

কিন্তু জ্ঞানের সীমাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোলব্রুকের রচনাভঙ্গীর সৌন্দর্য বাড়লো না। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রচনার আশ্চর্য নিপুণতা তাঁর ছিল। বাক্যবিস্তারের কৌশল আয়ত্ত না করতে পারায় বিষয়-বস্তুর গৌরবে ও আলোচনার মৌলিকতায় তাঁর রচনা পণ্ডিতমণ্ডলীর বাইরে পৌঁছাল না। যাঁরা এই সব বিষয়ে উৎসাহী তাঁরাও রচনার কাঠিন্য ও নীরসতায় বাধা পেতেন। নিজের এই ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন আর সেই জন্যেই যে নাটক বা কাব্যের অনুবাদে হাত দেননি তা তিনি নিজেই বলেছেন।

১৮১০ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অনুবাদ তিনি প্রকাশ করলেন। হিন্দু আইনের দায়ভাগ ও মিতাক্ষর উত্তরাধিকার

রীতিগুলির যথার্থ পার্থক্য য়ুরোপীয় রাজপুরুষদের কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না। প্রশাসনিক প্রয়োজনের জন্য এবং নিজের কাজ হিসাবেও বটে তিনি এই কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের ধারণা ছিল যে হিন্দু আইনের সার সংকলনের চেয়ে এই অনুবাদটি তাঁর শ্রেষ্ঠতর কীর্তি।

ভারতবর্ষের বিদ্যা তাঁকে যেমন আকর্ষণ করেছিল তেমনি করেছিল ভারতবর্ষের প্রকৃতি। পূর্ণিয়ায় থাকার সময় প্রতিদিন রৌদ্রকরোজ্জ্বল শ্রেণীবদ্ধ পর্বতমালা তাঁর দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। মনে প্রশ্ন জাগতো কত উঁচু এই পাহাড়। তাই নিয়েই খোঁজখবর করতে লেগে গেলেন। তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন অনেক। উত্তর ভারত বিধৌত করে চলেছেন গঙ্গা—বিদেশী পান্থের মনে প্রশ্ন জাগলো—"নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ।" মুখ্যতঃ তাঁরই উৎসাহে ক্যাপ্টেন হজসন ও লেফটেনেণ্ট ওয়েব দুটি অভিযানের দায়িত্ব নিলেন। সে সম্বন্ধে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটিতে রিপোর্টও দাখিল করলেন। কোলব্রুক খুব উৎসাহিত বোধ করলেন না। কারণ ওয়েবের রিপোর্ট তাঁর বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। তবু পূর্বঅভিযানকারী কর্ণেল ক্রফোর্ড ও ওয়েবের রিপোর্ট মিলিয়ে তিনি দেখলেন যে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ২৭৫৫০ ফুট। যখন নিজের ধারণা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে হলো তখন এসিয়াটিক সোসাইটির দ্বাদশখণ্ডে তার রিপোর্ট ছেপে প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে নিবিড় নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি হিমালয় সম্বন্ধে বলেছিলেন। "I call them my mountains." কোলব্রুকের কর্মচঞ্চল পরিশ্রমক্লান্ত জীবনে পরিবর্তনের দখিনা বাতাস এসে লাগলো। জনসন উইলকিনসনের কন্যা এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। বিয়ের পরে অল্প কয়েকবছর মিসেস কোলব্রুক বেঁচেছিলেন। অন্যতম

সন্তানের অকালমৃত্যু তাঁকে যে অসুস্থতার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল তা থেকে তিনি আরোগ্য লাভ করেননি কোনদিন। অল্পদিনের দাম্পত্য-জীবন হলেও কোলব্রুক স্ত্রীর বিরহের গুরুতর আঘাতে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সংসারের শান্তি নষ্ট হয়েছে—মন বেদনার্ত, কর্মে অবসর গ্রহণের সময় আসন্ন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরলেন।

দেশে গিয়ে তিনি আরও বাইশ বছর বেঁচেছিলেন। বিজ্ঞানচর্চায় অধিকতর মনোযোগ দিয়েছিলেন, এস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ দেখা গেল। কেবলই বলতেন গণিতজ্ঞ হবার জন্যই বিধাতা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তিনিই কেবল অন্য কাজে শক্তি ক্ষয় করেছেন। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কোলব্রুক প্রচুর পরিমাণে পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন; সে গুলির মূল্য দশ হাজার পাউণ্ডের কম নয়। সেই সমগ্র সংগ্রহ তিনি তুলে দেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। ভারতবর্ষে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার যে ঢেউ উঠেছিল তার ধাক্কা ইংলণ্ডেও গিয়ে লাগলো। সেখানেও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি গড়ে উঠলো। প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় যাঁরা উৎসুক তাঁরাই এগিয়ে এলেন—তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন কোলব্রুক ও উইলকিন্স। তিনি হলেন তার প্রথম পরিচালক বা ডিরেক্টর।

জীবনের শেষ কয়েক বছরে নানা রকমের আঘাত তাঁকে সইতে হয়। মার মৃত্যু, একটি পুত্রের মৃত্যু, সম্পত্তিগত ক্ষতি ও এসব সত্ত্বেও পড়াশুনার একাগ্রতা তার শরীর জীর্ণ করে দিল অতি দ্রুত। সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হলো এই যে দৃষ্টিশক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হতে লাগলো, প্রায়-অন্ধত্বের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে দিন কাটতে লাগলো তাঁর। শেষ তিনটি বছর শুয়ে শুয়ে তিনি কাটিয়েছেন—কিন্তু আশ্চর্য ছিল তাঁর মনের ক্ষমতা। তাঁর দুর্ভাগ্য নিয়ে কেউ তাঁকে অনুযোগ করতে শোনে নি কোনদিন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। বড় চাকরীর আকাজ্ক্ষা নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতবর্ষ তাঁকে সেই মোহ থেকে মুক্তি দিল—তার পরিবর্তে তিনি দিলেন জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি। পরিতৃপ্ত মনের আনন্দ তিনি বেছে নিলেন বৈষয়িক ক্রমোন্নতি না হওয়ার অতৃপ্তিকে পিছনে ফেলে। ভারতবর্ষ এই জ্ঞানতপস্বী ভারতবিদ্যাচর্চার পথিকৃৎদের যেদিন ভুলে যাবে সেদিন তার দুঃখের অবধি থাকবে না।

আলেকজাণ্ডার সোমা ভ কয়োসী

দ্রুত যানবাহনের দিনে আজ কে এমন পাগল আছে যে অন্য দেশ জানবার তাড়ায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস হেঁটে চলবে, পার হবে মরুভূমি, খরস্রোতা নদী, তুহিন শীর্ষ পর্বতশৃঙ্গ। কিন্তু এমন মানুষও আছে। যখন সাগর পার হয়ে জাহাজ চলেছে ইউরোপ থেকে এসিয়া, বেষ্টন করে চলেছে আফ্রিকা, যখন নানা জাতের পণ্যব্যবসায়ী ভারত চীন জাপানের বন্দর ভরে ফেলেছে তখন এক পাগল পথচলা পথিক ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন সম্পূর্ণ অজানা এক পথে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। অত্যুচ্চ শৈলমালায় বেষ্টিত সভ্য জগতের সঙ্গে যোগ রহিত হয়ে দিনের পর দিন পড়ে ছিল তিব্বত। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও সভ্যতার অনেকাংশ তিব্বতে আশ্রয় পেয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে রক্ষিত হয়ে আসছিল। সেই তিব্বতী ভাষা শিক্ষা ও আলোচনার পথ সুগম করে তিনি ভাবীকালের পথিকদের পথ চলা সহজ করে দিলেন।

ট্রান্সিলভেনিয়ার একটি শান্ত গ্রাম কোরেসি—১৭৮৪ খৃঃ-এ এপ্রিল মাসে সেই গ্রামে আলেকজাণ্ডার সোমার জন্ম। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর পূর্বপুরুষেরা পারদর্শী ছিলেন। বহুকাল ধরে অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা হাঙ্গেরীর দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে তুর্কী আক্রমণ ঠেকিয়েছেন। সোমার পিতার নাম অ্যানড্রু, মার নাম ইলোনা। যে গৃহে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে গৃহ আগুনে নষ্ট হয়েছিল। তবে এখনকার গ্রাম রেজিস্টারে ১৪৩ নম্বরের যে বাড়ি তা সেই মূল বাড়ির ভস্মাবশেষের ওপরেই গড়ে উঠেছিল।

নিকটাত্মীয় ও বন্ধু জনের সাক্ষ্যেই জানা গেছে যে আলেকজাণ্ডার বুদ্ধির দীপ্তি বহন করতো তার উজ্জ্বল মুখশ্রীতে—কঠিন শক্তি প্রকাশ

পেতো লৌহ দৃঢ় বাহু এবং বক্ষপটের বিরাট বিস্তারে। গ্রামের স্কুলেই শিক্ষা শুরু হয়েছিল সোমার। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নজ এনিড কলেজে তিনি ভর্তি হলেন। সেখানে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন প্রফেসার স্যামুয়েল হেগেডাস। বয়সের ব্যবধান পার হয়ে গুরুশিষ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলো। পরবর্তী কালে এই কৃতী ছাত্র সম্বন্ধে হেগেডাস লিখেছিলেন যে ক্রোধ তাঁকে স্পর্শ করেনি, হঠকারিতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, নিতান্ত শান্ত ছিল প্রকৃতি, কথা বলতেন অল্প, করুণামাখানো মুখের মধ্যে দরদভরা স্নিগ্ধ দুটি চোখ মানুষটির পরিচয় বহন করতো। বেশভূষায় বিলাস ছিলনা—অল্পে তুষ্ট হতে জানতেন—"সোমা ছিলেন সেই সৌভাগ্যবানদের একজন যাদের বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ নেই, যারা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করে না।"

ছাত্রজীবনে গভীর জিজ্ঞাসা ছিল মনে—হাঙ্গারীয় জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে। নানা রাজ্যের ইতিহাস পড়লেন, আরবী ভাষা শিখলেন আর মনে মনে ঠিক করলেন যে সারা জীবন দেশান্তর ঘুরে খুঁজে বার করতে হবে হাঙ্গারী জাতির পরিচয়। নজ এনিডে বেথলেন কলেজে সোমা কবিতার অধ্যাপক হলেন। অবসর সময়ে টুকরো টুকরো কবিতাও লিখেছেন কিন্তু তা প্রকাশ করার তাগিদ ছিলনা একটুও। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্কলারশিপ নিয়ে গটিনজেনে পড়তে গেলেন—সেখানে মোটামুটি শিখে নিলেন ইংরাজী। স্কুল কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ চুকিয়ে সোমা যেদিন দেশে ফিরলেন তখনই অধ্যাপক হেগেডিয়াস কাজ দিতে চাইলেন। কিন্তু সোমার মন তখন অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্লাভোনিক ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে ক্রোসিয়া যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। হেগেডিয়াস সোমাকে এই যাত্রায় উৎসাহ দেননি বরং বারবার বাধাই দিয়েছেন। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরলেন সোমার সামনে, পথের বিপদসংকুলতার কথা বল্লেন—কিন্তু স্থির

সিদ্ধান্ত পথিকের যাত্রার পথ বদলালো না। প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য তখন তাঁকে প্রাচ্য দেশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় সোমা এসে জানালেন হেগেডিয়াসকে যে পরদিন তিনি যাত্রা শুরু করবেন। সন্ধ্যায় দুজনে ব্যস্ত রইলেন গল্পে। হেগেডিয়াস আর বাধা দিলেন না। পরদিন আবার এলেন সোমা—এসে বল্লেন 'তোমায় আর একবার দেখতে এলুম।' দেখে মনে হলো যেন কাছেই কোথাও চলেছেন। দুজনে বেরুলেন পথে। পথের শেষে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে থেমে গেলেন হেগেডিয়াস। সোমা শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন—যতদূর দেখা গেল হেগেডিয়াস দাঁড়িয়ে রইলেন। পাগল ছাত্রের জন্য বৃদ্ধ শিক্ষকের কি ব্যাকুল উৎকণ্ঠা। হেগেডিয়াসের নিজের বিবরণই তুলে দিলাম। "Next day that is monday, he again stepped into my room, lightly clad as if he intended merely taking a walk. He did not even sit down but said 'I merely wished to see you once more'. We then started along Szentkiralyi road which leads towards Nagy Szeben. Here in the Country among the fields—we parted for ever. I looked a long time after him as he was approaching the banks of the Maros."

অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পথচলার পাথেয় হলো গভীর বিদ্যার্জনের স্পৃহা মধুর ব্যবহার আর মুখে লেগে থাকা শান্ত অমায়িক হাসি। অসাধারণ ছিল দৈহিক শক্তি তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল মনের জোর। কী দারুণ অভাবের মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে তা বলে শেষ করা যায় না। অমায়িক মুখের মধ্যে দৃঢ়চিত্ত মানুষ লুকিয়ে থাকতো—কত বন্ধুর অযাচিত দান তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন—১৮৩৬ সালে হাঙ্গারীর বন্ধুরা তাঁর জন্য টাকা তুলেছিলেন সে টাকাও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮১৯ খৃঃ-এ নভেম্বর মাসে সোমা হাঙ্গারীর পার্বত্যসীমানা পার হয়ে চলে গেলেন। ভেবেছিলেন পায়ে চলা পথেই কনস্টান্টিনোপল পার হয়ে এসিয়ায় ঢুকবেন, অবস্থা বিপর্যয়ে তা সম্ভব না হওয়ায় জাহাজে করে চলে গেলেন মিশরে। যেখানে গেছেন সেখানেই অঞ্জলি ভরে কিছুনা কিছু সঞ্চয় করে এনেছেন। মিশরে আরবী শিখলেন—সেখান থেকে সাইপ্রাস, লাটাকিয়া, আলেপ্পো। এখান থেকে পায়ে হেঁটে এবং নৌকোয় ২২শে জুলাই বাগদাদ। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ঘোড়ায় চড়ে বাগদাদ থেকে তেহরাণ যাত্রা করে তেহরাণ পৌঁছলেন ১৪ই অক্টোবর। তেহেরাণে এসে একজনও য়ুরোপীয় চোখে পড়লো না। ইংরাজ দূতাবাসের এক স্থানীয় ভৃত্য অবশ্য যথেষ্ট সমাদরে সোমাকে অভ্যর্থনা করেছিল। তারপর দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা যখন ফিরে এলেন তখন সোমা তাঁদের কাছে তাঁর উদ্দেশ্য জানালেন। দূতাবাসের হেনরী উইলক আর জর্জ উইলক চার মাস তাঁকে তেহরাণে রাখলেন, সেখানে সোমা পারসী শিখলেন, ইংরাজীটাও ঝালিয়ে নিলেন, পুথিপত্র আলোচনার সুযোগ হলো, পার্থিয়াস রাজবংশের রৌপ্যমুদ্রা তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ১লা মার্চ ১৮২১, পারস্য দেশীয় পোষাকে সোমা তেহরাণ ছেড়ে বেরুলেন—নাম হলো সেকেন্দার বেগ। ইংরাজ বন্ধুরা জনসনের ছোট একটা অভিধান দিলেন বন্ধুত্বের স্মারক চিহ্ন হিসেবে। খোরাসান পার হয়ে এলেন বোখারায়, সেখান থেকে তীর্থযাত্রীর বেশে কাবুল। কাবুল থেকে পেশওয়ার হয়ে নানাপথ ঘুরে কাশ্মীর।

আড়াই বছর পথে পথে কাটিয়ে—জাহাজে, নৌকায়, ঘোড়ায়, পায়ে হেঁটে তিনি এলেন ভারতবর্ষে। এই দুর্গম পথে কপর্দকশূন্য অবস্থায় বিদেশীভাষার প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে একলা এসেছেন—হাঙ্গারী জাতির উৎপত্তি সন্ধানে। কাশ্মীর সীমান্তে মুরক্রাফ্‌টের সঙ্গে দেখা—মুরক্রাফ্‌ট্ নূতনের সন্ধানে বেরিয়েছেন। দুই সন্ধানী

মনের পরিচয় ঘটলো দূর বিদেশে তুষারাচ্ছন্ন ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রান্তসীমায়। সুদীর্ঘ পথচলার পর সোমা বুঝতে পারছিলেন যে হাঙ্গারী জাতির উৎপত্তির তত্ত্বসন্ধানে আরও পূর্ব দেশে যাওয়ায় বিশেষ ফল হবে না। মুরক্রাফ্‌ট্‌ তাঁর পথ দেখালেন—বল্লেন তিব্বতীভাষা শিখতে—সোমাকে উপহার দিলেন ফাদার গর্গির 'এলফাবেটান টিবেটানাম'। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত উপকরণ থেকে রোমে ছাপা এই বইখানিই সোমার ভবিষ্যৎ সাধনার প্রথম পাঠ জোগালো।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের তুহিনাবৃত বিরাট ভূখণ্ডে বাস করলেন সোমা—কাশ্মীরের রূপে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন জানা নেই—তবে একটি বছর তিনি গর্গির এলফাবেটান পড়ে কাটিয়ে দিলেন। তিব্বতী ভাষার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করলেন, মনে মনে স্থির করলেন যে তিব্বতী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হবে। নতুন সংকল্প জাগা মাত্রই মন স্থির হয়ে গেল। তিব্বতের উচ্চমালভূমিতে যে সম্পদ লুকানো আছে তারই সন্ধানে যাবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সোমার জীবনের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশের সন্ধান দিলেন মিঃ মুরক্রাফ্‌ট্‌। যখন কাশ্মীরের সৌন্দর্যস্বর্গে সোমা তাঁর পুরানো সন্ধানের সূত্র সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন তখন মুরক্রাফ্‌ট্‌ এলেন তাঁর সাহায্যে। অর্থ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, চিঠিপত্র ও পরিচয়-পত্র দিয়ে মুরক্রাফ্‌ট্‌ লে'র প্রধান অফিসার জানস্কারের লামার কাছে সোমাকে পাঠালেন। ১৮২৩-এর ২রা মে সোমা গেলেন তিব্বতে।

১লা জুন লাডকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুরক্রাফ্‌টের চিঠি নিয়ে সোমা হাজির হলেন। প্রধানমন্ত্রী এই দূরাগত জ্ঞানভিক্ষুকে দেখে মুগ্ধ হলেন। সস্নেহে সাদর সম্ভাষণ জানালেন, পত্র দিলেন য়াংলার লামাকে, দিলেন পাসপোর্ট আর দিলেন আট পাউণ্ড চা—পার্বত্য

শীতের প্রধান পানীয়। ১৮২৪এর ২২শে অক্টোবর তিনি লাডকের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে জানস্কারে পৌঁছলেন। সেখানে লামার সহায়তায় তিব্বতী সাহিত্য পড়া শুরু হলো। তিব্বতের প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে সোমার পরিচয় ছিল না। ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশী সেখানকার শীত। অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত দিনেও তুষারে ছেয়ে যেত ভূমি, শস্য চাপা পড়ে যেত সেই তুষারের আচ্ছাদনে। পূরো চার মাস তিন ফুট চওড়া আর তিন ফুট লম্বা একটা ঘরের মধ্যে শিক্ষার তপস্যায় সোমার কাটলো, আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা নেই, আলো জ্বলেনা রাতে কঠিন মাটিই হলো শয্যা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত তাঁর পড়ার সময়। এই সময় নিজের শিক্ষার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে লামার সাহায্যে তিনি তিব্বতী ভাষার ব্যাকরণ-গত গঠন আয়ত্ত করেছিলেন এবং তিব্বতী সাহিত্যের মূল ঐশ্বর্য তিনশো কুড়িটি গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। শীতকালে যখন শীতের প্রাবল্য সব রকম অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেল তখন লামার সঙ্গে পরামর্শ করে সোমা দক্ষিণে চলে এলেন। তুষারপাত বন্ধ হবার আগেই তিনি কুলু উপত্যকায় চলে এলেন। ২৬শে নভেম্বর তিনি স্তাবাথুতে এসে পৌঁছলেন। দুর্গম পথ তুষারপাতে দুর্গমতর হওয়ায় লামা আর এলেন না।

ভারত সীমান্তে স্তাবাথু নামক স্থানে সোমা যখন এসে পৌঁছলেন তখন সেখানে প্রান্ত রক্ষীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো—এ কোন এক অপ্রত্যাশিত আপদ তাদের শান্ত গতানুগতিক জীবনে বিঘ্ন ঘটায়। ভারপ্রাপ্ত অফিসার আম্বালার পলিটিকাল এজেন্টকে জানালেন যে এক অপরিচিত পথিক যার নাম সোমা দ্য করোসী হঠাৎ এসে পৌঁচেছে—কি করি তাকে নিয়ে। ব্যাপার গড়ালো কলকাতা পর্যন্ত—উত্তর এলো—গভর্ণর জেনারেলের কাছ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই অপরিচিত অতিথিকে আটকে রাখো। লর্ড

আমহার্স্ট সোমার কাছে এক বিস্তৃত বিবৃতি দাবী করলেন। মুরক্রাফ্‌টের পত্র যে যথেষ্ট হবে না একথা সোমা একেবারেই ভাবেন নি। তিনি উত্তরে আমহার্স্টকে জানাচ্ছেন—

After my arrival at this place, not withstanding the kind reception and civil treatment with which I was honoured I passed my time although in much doubt as to a favourable answer from Government to your report, yet with great tranquility till 23rd inst, when on your communication of the government's resolution on the report of my arrival I was deeply affected and not little trouble in mind, fearing that I was likely to be frustrated in my expectations.

পঞ্জাবে রণজিৎ সিংয়ের প্রবল প্রতাপ এবং রুশ সরকারের গুপ্তচরদের গোপন আনাগোনায় ইংরাজ সরকার তখন সীমান্ত প্রবেশের আইন কানুন বেশ জটিল করে তুলেছে, তারই চাপে সোমা আটকে গেলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সোমাকে সরকার জানালেন যে ভাষার কাজে গবেষণা চালাবার জন্য তাঁকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে। কৃতজ্ঞচিত্ত সোমা উত্তরে জানালেন যে তিব্বতী ভাষার একটি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ, তিব্বতী-ইংরাজী অভিধান, তিব্বতী সাহিত্যের ইতিহাস তিনি রচনা করার প্রতিশ্রুতি তিনি দিচ্ছেন। এই সময়ই তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন যে সোমা যেমন করে তিব্বতী ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন এমন করে আর কোন য়ুরোপীয় পারেন নি।

১৮২৫ সালের জুন মাসে সোমা আবার চল্লেন তিব্বতে। প্রথমবারের যাত্রায় আশানুরূপ ফল হয়নি। বনের মধ্য দিয়ে ভেড়াদের

পথ ধরে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে সোমা প্রথমে পৌঁছলেন সিমলায়। আজকের রাজপুরুষদের গ্রীষ্মাবকাশ সিমলার সেদিন নিতান্ত দৈন্য দশা—আজকের মত তার না ছিল রূপ না ছিল জৌলুষ। সেখান থেকে কোটাগড় হয়ে তিব্বতের গভীরে। যখন এই দুর্গম পথ পার হয়ে তিনি জানস্কারে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন সেই লামা অন্যকাজে বেরিয়েছেন তিব্বতের অন্য অঞ্চলে। তিনি ফেরবার পর সোমার সঙ্গে কাজ করতে রাজী হলেন। নভেম্বর থেকে সোমার কাজ শুরু হলো আবার। জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা করতে লাগলেন। প্রাণ মন একাগ্র করে কাজে ঢেলে দিলেন। তিব্বত নেপালে নানা অঞ্চল ঘুরে লামা সেই সব দেশের সম্বন্ধে নানা জ্ঞানের অধিকারী হলেন। ৫২ বছরের সেই লামা স্থানীয় রাজার বিধবা রানীকে বিয়ে করেন। সোমার প্রতি তাঁর ভালবাসার অন্ত ছিল না। দূরাগত এই পথিককে জ্ঞানী পণ্ডিত ভালবেসেছিলেন। ঘরছাড়া এই তপস্যারত মানুষটির প্রতি তার ছিল আন্তরিক মমতা। কিন্তু মাঝে মাঝে সোমার তাড়ায় আর তাগাদায় তিনিও পাগল হয়ে উঠতেন। সোমার সঙ্গে তাল রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। তিব্বতী অভিধানের বহু শব্দের অর্থ ও ইতিহাস তিনি সোমাকে জুগিয়ে দিলেন। চলিত অচলিত সহজ কঠিন বহু সহস্র শব্দের হিসাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে বৌদ্ধ লামা একদিন তাঁর পাগল ছাত্রকে ছেড়ে গেলেন। অন্য শিক্ষকের সন্ধান করলেন সোমা। কিন্তু সেই কঠিন পার্বত্য শীতের দেশে নিঃসহায় নিঃসম্বল সোমার সাহায্যে কেউই এগিয়ে এলো না। ভগ্নহৃদয়ে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হলো ভারতবর্ষে অসমাপ্ত কাজের বোঝা নিয়ে।

ফিরে এসে নিজের কাজের যে রিপোর্ট দিলেন তা তাঁর আন্তরিক সততার পরিচয় দেয়। সহজেই বলতে পারতেন যে অনেক কাজ করেছেন অনেক সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে

জানালেন—"I think it sufficient to state that I was disappointed in my intentions by the indolence and negligence of that Lama to whom I returned, I could not finish my planned works as I proposed and promised. I have lost my time and cost."

তিনি যে অর্থ নিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে পারছেন না এই চিন্তা তাঁকে কেবলই পীড়িত করেছে। তিনি যা কিছু সংগ্রহ করেছেন সবই সরকারের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন। কঠিন দুঃখকষ্টেও তাঁর আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়নি। তাই রিপোর্টে তিনি বললেন "I never meant to take money, under whatever form, for the editing of my works·· my honour is dearer to me than the making as they say of my fortune."

দুঃখকে তিনি দুঃখ বলে মনে করেন নি। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত অনিশ্চয়তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। আবার তিব্বত যাবার সুযোগ যদি না আসে তা হলে কেমন করে ঐ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হবে। কানুম মঠের বলিরামের কাছে যে পুথি দেখে এলেন তার কি হবে, তখনকার একটি চিঠিতে লিখছেন "uncertainty and fluctuation is the most cruel and oppressive thing for a feeling heart."

ভারতবর্ষে ফিরে সোমাকে যে এই সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হলো তার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। যখন দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতবর্ষ ছেড়ে জানস্কারে গিয়ে তিনি তিব্বতী ভাষার চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন সেই সময়ে কলকাতায় এক ইটালীয়ান মিশনারীর কাগজপত্রের মধ্যে তিব্বতী গ্রামার ও অভিধানের দুটি সংক্ষিপ্ত লেখন পাওয়া গেল। কলকাতার সহরে তখন এমন কেউ নেই যিনি এই রচনার সঠিক মূল্য যাচাই করতে

পারেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অত্যুৎসাহী কর্মচারীরা মনে করলেন যে কাজের জন্য সোমার পিছনে অর্থব্যয় সে কাজ তো বিনা পরিশ্রমেই সম্পূর্ণ অনায়াসেই পাওয়া গেল। উৎসাহের আধিক্যে সেই অভিধান তখনই শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপতে চলে গেল।

সরকারী অর্থ সাহায্য সোমার বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ ভাবলনা তিব্বতের হিমাচ্ছাদনে সাধনামগ্ন সেই একটি লোকের দিন কেমন করে চলবে। বাধ্য হয়ে সোমাকে ফিরতে হলো। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি এই অবজ্ঞা অবহেলা তাঁকে কী দুঃখ দিয়েছিল তা আজও অনুমান করা শক্ত নয়।

ইংরাজ সরকারের আনুকূল্যে যখন শ্রীরামপুর থেকে তিব্বতী অভিধান বেরুল, তখন আত্মগরিমায় মুগ্ধ ও আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো ভারতের ইংরাজ রাজপুরুষেরা। এমন সময় জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ প্রফেসর ক্ল্যাপরথ এক তীক্ষ্ণ সমালোচনায় ঐ অভিধানের ভ্রান্তি বাহুল্যকে আক্রমণ করলেন। ইংরাজ রাজপুরুষদের আত্ম-প্রশংসার ফুল ফুটতে না ফুটতেই ঝরে গেল।

ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে সমস্ত অবস্থাটি বুঝিয়ে বল্লেন সোমার বন্ধু মেজর কেনেডী। আমহার্স্ট নির্বোধ ছিলেন না। তিনি জানতেন সোমার কাজ ইংরাজ জাতিরই গৌরব বৃদ্ধি করবে।

"European Scholars—Klaproth in particular had put forth his great authority, to cast contempt on the endeavours of the English in Indla to study Tibetan. To send forth Csoma again was, therefore not only to incur the expense of doing work twice over in India but also to run the risk of double share of ridicule in Europe. Amherst realised however, that there was a man capable of doing a great work for the British nation."

তারপর একদিন ছমাস পরে তাঁর দ্বিধাশংকিত চিত্তের উদ্বেগ ঘুচিয়ে এল সরকারী আদেশপত্র তাতে আরও তিনবছর তাঁকে তিব্বত গিয়ে পড়াশুনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেবার হুকুম হলো। সেই আদেশপত্র ১০ই সেপ্টেম্বরের ১৮২৭ সরকারী গেজেটে ছাপা হলো।

"The Governor General was pleased to allow Csoma de Koros leave to proceed to upper Besarh for a period of three years, for the purpose and on conditions specified in his letter of the 5th of May and that his lordship had given authority to pay that gentleman fifty rupees a month for his support and perhaps enable him to purchase Tibetan manuscripts."

তৃতীয় বারের জন্য সোমা গেলেন তিব্বতে। যে দেশ থেকে দুবার তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছে—আবার এলেন সেই দেশে। আবার সিমলা হয়ে কোটাগড়ের পথ ধরে শতদ্রু নদীর উপত্যকা দিয়ে তিনি চলতে চলতে কানুমে এসে পৌঁছলেন। কানুমের সংঘারামের সেই কঠিন শীতে কেমন করে দিনের পর দিন কাটিয়ে তিনি একা কাজ করেছিলেন সে খবর পৃথিবীর কাছে চিরদিনই অজানা থাকতো। কিন্তু এই সময় ডাঃ গেরার্ড নামে এক চিকিৎসক গেলেন তিব্বতে টীকা দেবার জন্য। ১৮২৯ সালের ৯ই জুলাইয়ে গভর্ণমেণ্ট গেজেটে গেরার্ডের ভ্রমণ বিবরণ বেরুলো—তার মধ্যে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তিনি এই আত্মনিমগ্ন সাধকের কথা লিখেছেন।

একটি ছোট্ট ঘরে চতুর্দিকে স্তুপীকৃত পুস্তকের মধ্যে সেই আত্মভোলা সাধককে ডাঃ গেরার্ড খুঁজে পেলেন। প্রচণ্ড শীতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পশমের জামায় ঢেকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সোমা কাজ করে যান—বিরাম নেই। মাঝে মাঝে মাখন দেওয়া চা খান। তিব্বতী ভাষায় তাঁর জ্ঞান তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। লামার

সাহায্য না নিয়েই কাজ করে চলেছেন। বাইরের জগতের সুখদুঃখ হাসিকান্নার উর্ধ্বে উঠে তিনি মনোনিবেশ করেছেন নিজের সাধনায় একান্তভাবে। পৃথিবীর কাছে তিনি যে এক বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার খুলে দিতে পারবেন এই মনে করেই তিনি খুসী। ডাঃ গেরার্ড জানাচ্ছেন যে সোমা লামাকে দিতেন পঁচিশ টাকা, চাকর পেতো পাঁচ টাকা। বাকী কুড়ি টাকায় খাওয়া আর বই কেনা। প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস দুশো মাইল দূরে ভারত সীমান্ত থেকে আনতে হয়। সমুদ্র থেকে সাড়ে ন-হাজার ফুট উপরে কানুমে সোমার ঘর। দূরে কাছে বৌদ্ধ মঠগুলিতে সারা দিন সারা রাত গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যায়। সন্ধ্যার বিষণ্ণ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই বিদেশী পান্থ শুনতে পান এই ঘন তুষারাচ্ছন্ন গিরিবক্ষ থেকে হৃদয় মন্থন করা ধ্বনি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।' সারা জগতের কর্মস্রোতে বিস্মৃত গৃহ-পলাতক এই শিশুচিত্ত কোন্ দুরধিগম্যকে লাভ করার আশায় প্রাণে মনে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে। বিরাট পেটা ঘণ্টায় আঘাত পড়ে, সারা পাহাড়ের গা বেয়ে সেই ধ্বনি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে মিলে যায়।

সোমার কাজের একটা বড় বাধা ছিল তিব্বতী লামাদের গোঁড়ামী। ফলে পুথিপত্র পেতে দেরী হতো। প্রথম ভারত প্রবেশের সময় স্যাবাথুতে যে তাঁকে গুপ্তচর সন্দেহ করা হয়েছিল এ কথা তিনি ভোলেন নি। তাই ডাঃ গেরার্ডের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য গ্রহণ তিনি করেন নি। শিশুর মতন সহজ সারল্যে তাঁর প্রতি বিশ্বের অনাদর সম্পর্কে মনে অভিমান পোষণ করতেন—সঙ্গে সঙ্গে এও বলতেন যে আর অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মূল্য সবাই বুঝবে। তাঁর স্বভাবচরিত্র নিয়ে পাছে কখনো কেউ কিছু বলে এই সঙ্কোচে অসুস্থ বোধ করলেও তিনি স্থানীয় আঙ্গুরের রস পান করতেন না। দুর্গম হিমারণ্যে বইয়ের অভাব প্রবলভাবে অনুভব করতেন। এসিয়াটিক সোসাইটির নীরবতায় মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

সুদীর্ঘকাল কষ্ট করার পর এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে পঞ্চাশ টাকা করে সাহায্য দিতে রাজী হলো। তিনি এই চিঠিতে লিখলেন "আপনাদের সহায়তা গ্রহণ না করতে আমায় অনুমতি দিন। ১৮২৩ সালে মুরক্রাফ টৃ আমার হয়ে আপনাদের কাছে কিছু প্রয়োজনীয় বই চেয়েছিলেন। সে সব আজও পাইনি। ছ বছর ধরে আমার প্রতি আপনারা ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। এখন এই অবস্থায় আমার আর কোন বই চাইনা।" প্রকৃত ঘটনা সোমার কাছে পৌছায় নি। ডাঃ গেরার্ড এবং ক্যাপ্টেন কেনেডি সোমার কথা ক্রমাগতই কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছেন।

১৮৩০ এর শীতকাল পর্যন্ত সোমা ছিলেন কানুমে। তাঁর সুদীর্ঘ পরিশ্রমের প্রথম ফলসম্ভার নিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন ১৮৩১-এ। তদানীন্তন লর্ড বেন্টিক গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। সোমার বেতন তিনি দ্বিগুণ করে দিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে ঐ বেতনেই সরকার সোমাকে সোসাইটির কাজে লাগালেন।

১৮৩৩ সালে হোরেস হেম্যান উইলসন চলে গেলেন ইংলণ্ড। সুদীর্ঘকাল দূর থেকে তিনি সোমার কাজ ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। তিনি চলে যাবার পর এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী হয়ে এলেন জেমস প্রিন্সেপ। প্রিন্সেপ গভীর অনুরাগে সোমার বইগুলি ছাপার কাজে লাগলেন। বৃটিশ সরকারকে এক সুদীর্ঘ পত্রে তিনি জানালেন যে এই বইগুলি ছাপাতে যা খরচ হবে তা বইগুলির গুরুত্বের তুলনায় কিছুই নয়—তিনি নিজেই প্রুফ দেখার দায়িত্ব নিলেন। তখনকার দিনের পণ্ডিতমহলে সোমার নাম ছড়িয়ে গেছে। প্রধানতঃ প্রিন্সেপের চেষ্টাতেই সোমা এসিয়াটিক সোসাইটির অনরারী সভ্য হলেন। এছাড়া দেশবিদেশের নানা সম্মান কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কেবলই বলতেন কাজ করার আনন্দ ছাড়া আর কোন পুরস্কারে তাঁর প্রয়োজন নেই।

১৮৩৭ সালে সোমার তিব্বতী অভিধান ও ব্যাকরণ ছাপা হয়ে বেরুল। সেই বই দুটি বিতরণ ও বিক্রয়ের ভারও নিলেন প্রিন্সেপ। ভূমিকায় তিনি নিজেকে তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যের দীন ছাত্র বলে পরিচিত করেছেন। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় রয়ে গেলেন। বুঝলেন সংস্কৃত না জানলে ভাষাতত্ত্ব শেখার অনেকটাই বাকী রয়ে যাবে। ফলে তিনি ঠিক করলেন যে সংস্কৃত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলাও শিখবেন। ভারত সরকারের কাছে তিনি দুটি পাসপোর্ট পেলেন—তার একটি পারসী ভাষায় লেখা, নাম "মোল্লা এসকান্দার সোমা অজ মুলক-ই-রুম।"

তারপর বাংলা দেশের নানা জেলায় তাঁর অদম্য অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—মালদহ, কিসেনগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়িতে মেজর লয়েড সরকারী বাসভবনে স্থান দিতে চাইলে সোমা তা অস্বীকার করলেন। মেজর লয়েড লিখছেন—

"He (Csoma) would not remain in my house as he thought his eating and living with me would cause him to be deprived of the familiarity and society of natives with whom it was his wish to be colloquially intimate. I therefore got him a Common native hut and made it as comfortable as I could for him."

বাংলার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বাংলা ও সংস্কৃত আয়ত্ত করলেন। তারপর ১৮৩৭ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন এসিয়াটিক সোসাইটির সহ-গ্রন্থাগারিক হয়ে। জীবনযাত্রার সেই সরলমান একটুও বদলায়নি। চারিদিকে বই ছড়িয়ে মধ্যে পড়াশুনায় ডুবে থাকতেন—মাদুরে শুতেন। দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখতেন পাছে অধ্যয়নে বাধা হয়।

কিন্তু শান্ত পরিতৃপ্ত জীবন ধাতে সইবে কেন—দূর মঙ্গোলিয়ার স্বপ্ন তখনও চোখে। মনের ভিতরে সেই বরফ ঢাকা শৈলশৃঙ্গের

আহ্বান আসে—মনে হয় আরও কত অজানা পুথি ছড়িয়ে আছে, কটাই বা উদ্ধার করা গেল। অর্থ যশ, সম্মান সব তাঁর কাছে বোঝার মত। সব পিছনে ফেলে সেই নির্বাসনের জীবনে যাবার চেষ্টা চললো আবার। তখন তাঁর আটান্ন বৎসর বয়স। শরীর ভেঙ্গে পড়ার মুখে। বই কাগজপত্র যা ছিল সব সোসাইটিকে দিয়ে গেলেন—যদি আর না ফেরেন।

আবার চলা শুরু হলো—৬ই এপ্রিল ১৮৪২ দার্জিলিং পৌঁছলেন। আর্চিবল্ড ক্যাম্বেল তখন দার্জিলিঙে পলিটিকাল এজেন্ট। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সোমা প্রায়ই বলতেন—"What would Hodgson, Turnour and some of the philosophers of Europe had not given to be in my place when I get to Lasha."

সিকিম যাবার ইচ্ছা ছিল। সিকিমের রাজা তখন দার্জিলিঙে। তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে লাসা যাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করতে সোমা কথা বললেন। রাজপ্রতিনিধি সোমাকে দেখে হতবাক। তাঁরই মত সহজ তিব্বতী ভাষায় অনর্গল কথা বলে এই বিদেশী। তিব্বতী সাহিত্যের বহু অজানা খবর তার নখাগ্রে। ব্যবস্থা আয়োজন সবই হতো। কিন্তু শেষ আহ্বান এসে গেল তাঁর। অল্প-দিনের জ্বরে হঠাৎ সোমা মারা গেলেন। ঘন দেওদার সারির মধ্যে, যেখান থেকে দূরের সূর্যালোকদীপ্ত শৈলশৃঙ্গ দেখা যায়, সেই দার্জিলিঙের সমাধিক্ষেত্রে তাঁর দেহ রক্ষিত হল। সুদূর হাঙ্গেরি থেকে পথচলা পথিক একদিন জানবার আকর্ষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন আশ্রয় পেলেন পাহাড়ের কোলে। তারপর কত পথিক ঐ দুর্গম পথে গেছে, নানা জ্ঞানের রত্ন আহরণ করে এনেছে। কিন্তু যে নামের পরিচিতি নেই, সাধারণের কাছে যে নামের মূল্য নেই, ঘন পার্বত্য-ফুলের রাশি অতি সন্তর্পণে সে নামটি ঢেকে রেখেছে। মেঘঢাকা

আলেকজাণ্ডার সোমা ত্ত করোসী

কোন বিষণ্ণ দিনে অকস্মাৎ যদি কোন পথিকের চোখে পড়ে তাকে জিজ্ঞাসু করে তোলে। জীবনের সকল লোভ জয় করে দুর্গম পর্বতের জেলখানায় স্বেচ্ছাবন্দী থেকে সোমা একটি অপরিচিত ভাষাকে জ্ঞানোৎসাহীদের কাছে সহজলভ্য করে দিয়ে গেলেন। আজ একশো বছর পরে আমাদের প্রণাম কি তাঁর কাছে পৌঁছবে।

ফেলিক্স কেরী

মহৎ পিতার যোগ্য সন্তান প্রায়ই হয় না। বিরাট হিমালয়ের মত একটি মানুষের পিছনে পিছনে আসে খণ্ড ক্ষুদ্র মালভূমির মত অযোগ্য উত্তরাধিকারী। কিন্তু এমন ঘটনাও ঘটে যে, পিতার গৌরবোজ্জ্বল সুদীর্ঘ জীবন সমধিক গৌরবান্বিত পুত্রের জীবন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলে। অতটা না হলেও কিছুটা ঘটেছিল শ্রীরামপুরের মিশনারী উইলিয়াম কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স কেরীর জীবনে। উইলিয়াম কেরীকে মনে না রেখে উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আসন বিনামূল্যে জবরদখলের আসন নয়। সুদীর্ঘ জীবনের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম তাঁকে যে আসনের অধিকার দিয়েছে তার মূল্য ক্ষণস্থায়ী নয়। তাঁরই পিছনে আর এক কীর্তিমান পুরুষ সাঁইত্রিশ বছরের জীবন নিয়ে লুকিয়ে আছেন। বাংলা রচনার কৃতিত্বে যিনি পিতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, ভাষাতত্ত্বের অধিকার যাঁর ফাঁকির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, পিতার বহু কাজের যিনি ছিলেন একাগ্রচিত্ত সহচর সেই ফেলিক্স কেরীকে আজ আমরা ভুলেছি। শুধু সাহিত্য-সাধনা নয়; রাজনৈতিক কাজে, ব্যক্তিগত চিত্তবিক্ষেপের ফলে, ফেলিক্স কেরী একদিন পূর্ববাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, বর্মার বনে প্রান্তরে, পার্বত্য আঞ্চলে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দুঃসাহসী কল্পনাপ্রবণ চিত্ত তাঁর, শুধু যীশুখৃষ্টের নাম প্রচার করেই খুশী হয়নি। ভিতরে একটা পাগলা ঝোরার ক্ষেপামী ছিল আর ছিল উদাসীন নিরাসক্ত বাউলের মন। ভোগে ক্লান্তি ছিল না কিন্তু ভোগসুখ ত্যাগ করতেও দ্বিধা ছিল না মুহূর্তের।

১৭৯৩ সালে যখন উইলিয়াম কেরী ভারতবর্ষে মিশনের কাজ নিয়ে ইংলণ্ড ছেড়ে বেরুলেন সঙ্গে তাঁর ছ বছরের ছেলে ফেলিক্স।

১১ই নভেম্বর কেরী এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। ছ বছরের ফেলিক্স জাহাজ থেকে এসে নামল বাংলার শ্যামল প্রান্তরে। বাংলাদেশই তার দেশ হয়ে গেল চিরকালের মত। সমুদ্রপারের ইংলণ্ড আর কোনদিনই ফেলিক্স কেরীকে ফিরে পেল না।

বাংলাদেশে প্রথম দিন থেকেই ফেলিক্সের গুরুগিরির ভার পড়ল রাম রাম বসুর উপর। উইলিয়াম কেরীর একান্ত সাধ ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সংস্কৃতে পণ্ডিত হবে। বাংলার অক্সফোর্ড নদীয়ায় একদা কাজ করবার ইচ্ছা ছিল উইলিয়াম কেরীর। সুতরাং ফেলিক্স সংস্কৃত শিখবে এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা।

বাংলায় এসে প্রথম কিছুকাল কেরীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হল। সেই অবস্থায় মিসেস কেরী আর ফেলিক্স দারুণ রোগে আক্রান্ত হলেন। যখন কেরী গেলেন সুন্দরবনে তখন ফেলিক্স অপেক্ষাকৃত সুস্থ। পিতার সঙ্গে ডিঙ্গী করে নদী পার হচ্ছেন আর নিজেদের একটি কুটির বানাবার জন্যে জঙ্গল পরিস্কার করছেন। মালদহে পৌঁছে ফেলিক্স পরিষ্কার বাংলা বলছেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরী এসে পৌঁছলেন শ্রীরামপুরে। ইতিমধ্যেই ওয়ার্ড মার্শম্যান ইত্যাদি সেখানে জড়ো হয়েছেন। নতুন উৎসাহে তাঁদের কাজ শুরু হল। ছাপাখানাও কেনা হল। ছাপাখানার কাজ জানতেন ওয়ার্ড সাহেব, তাঁর সঙ্গে জুটে গেলেন ফেলিক্স।

আচারে ব্যবহারে ভদ্র হলেও বৈষ্ণবীয় বিনয় ফেলিক্সের খুব ছিল না। প্রকৃতি কিছুটা দুরন্তই বলা চলে। ওয়ার্ড সাহেব সামলে নিয়ে চলেন।

২০শে অক্টোবর তাঁর জন্মদিনে ফেলিক্স তাঁর প্রথম প্রার্থনা করলেন জীবনের, প্রথম প্রার্থনাসভায় ভাষণ দিলেন বলা যেতে পারে। ওয়ার্ড সাহেব তো মুগ্ধ। মার্শমান সাহেবের মনে হল

'From being a tiger he was transformed into a lamb'—তারপর শ্রীরামপুরের পথে পথে সেই বালক-প্রচারকের কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল, প্রভু যীশুর আনন্দবার্তা বহন করে তার অভিভাষণ মুগ্ধ করল সকলকে।

১৮০০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর।

গঙ্গার কূলে সবাই এসে দাঁড়ালেন, বহু হিন্দু মুসলমান জনতা এল কৌতূহলী হয়ে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর নামে সমবেত কণ্ঠে গান উঠল শ্রীরামপুরের আকাশে। বেলা তখন একটা। শীতের সূর্যের প্রসন্ন কিরণের দাক্ষিণ্যে তাপস্নিগ্ধ দিন।

কেরী বললেন সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে, ভাষণ দিলেন বাংলায়। প্রাণপ্রিয় পুত্র ফেলিক্সকে নিয়ে জলে নামলেন উইলিয়াম কেরী। নিজের বাম হাতে পুত্রের দক্ষিণ হাত ধরে নামলেন। তারপর এলেন কৃষ্ণপাল, প্রথম ভারতীয় খৃষ্টান। বাংলায় দীক্ষা দিলেন কেরী।

শান্ত নীরবতা বিরাজ করছিল গঙ্গাতীরের বটবৃক্ষে। প্রশ্ন জাগল ওয়ার্ড সাহেবের মনে—"হে মাটির দেবতা, পাথরের দেবতা, আজ একজন তোমাদের এত অবহেলায় ত্যাগ করল—তোমাদের আসন কি কেঁপে উঠছে না।"

উদাসীন পৃথিবী ওয়ার্ডের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। আসন কাঁপেনি আজও। গঙ্গার তীরে ত্রাণকর্তা যীশুর চেয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার ডাক অনেক প্রবল। শ্রীরামপুরের গীর্জার ধ্বনিকে ছাপিয়ে খণ্ডদেব জগন্নাথ মাহেশে ধ্বনি তোলেন অনেক বেশী। কিন্তু তবু সে বাংলাদেশে এক স্মরণীয় দিন।

সেদিনকার অপরাহ্ণে যখন তির্যক রবিদীপ্তি এসে পড়েছে কলপ্রবাহিনী জাহ্নবীর বক্ষদেশ রক্তাভ করে, তখন শ্রীরামপুরের মনের দিগন্তও সেই আলোকে আলোকিত হয়ে উঠল। ফেলিক্স

তার সহকর্মী কৃষ্ণপালকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল। গভীর আবেগের সঙ্গে কথা বললে কৃষ্ণর স্ত্রী রসময়ীর সঙ্গে।

বালক ফেলিক্স কিন্তু তখন আর বালক নেই। মার্শম্যান ওয়ার্ড প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হচ্ছে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ভেণ্ডারকেম্প দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন প্রচারের কাজে। ভারতবর্ষ থেকে সেই কাজে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিলেন উইলিয়াম ও তাঁর সহকর্মীরা। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে নাম রইল ফেলিক্সের।

ভারতবর্ষের প্রথম রবিবাসরীয় বিদ্যালয় শুরু করলেন ফেলিক্স। ১৮০৪ সালে গেলেন গঙ্গাসাগর মেলায় মিশনের হয়ে প্রচারের কাজ চালাতে।

এই সময় আর একটা নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করলেন তিনি। ডক্টর টেলরের কাছে শিখলেন চিকিৎসাতত্ত্ব। কলকাতার হাসপাতাল-গুলোয় ঘুরে ঘুরে মোটামুটি শিখে ফেললেন অনেকটা। পরবর্তী জীবনে এই চিকিৎসাবিদ্যা তাঁকে অল্প সাহায্য করেনি।

শিশুর সারল্য ছিল ফেলিক্সের। কোন কাজ তার পক্ষে ছোট এই বিকৃত আত্মাভিমান তাঁর ছিল না। খৃষ্টান গোকুলের যেদিন মৃত্যু হল সেদিন মার্শম্যানের সঙ্গে ফেলিক্স এসে নিজের কাঁধে কফিন তুলে নিলেন। সঙ্গে ছিল পীরু; সে ছিল মুসলমান। বাংলা দেশে সেই প্রথম মুসলমান যে খৃষ্টান হল।

দাঁড়িয়ে দেখল কৌতূহলী জনতা; ফেলিক্স, কৃষ্ণপাল আর পীরু বহন করে নিয়ে চলেছে গোকুলের কফিন।

শ্রীরামপুর মিশনারীদের কাজ ইতিমধ্যে যে একটানা অপ্রতিহত বেগে চলেছে তা নয়। মাঝে মাঝে বাধা আসে। জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপে অনিচ্ছুক সরকার মিশনারীদের কার্যকলাপ সব পছন্দ করেন না।

লর্ড মিণ্টো তখন ভারতের শাসনকর্তা। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের

ফলে হিন্দু মুসলমান প্রজা ক্ষেপে উঠেছে এই শুনে হুকুম দিলেন শ্রীরামপুর প্রেস কলকাতায় আনতে। বহু চেষ্টার পর কেরী আর মার্শম্যান দেখা করে বোঝালেন যে, মিশনের কাজে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি হবে না।

ব্যারাকপুরের সান্ধ্যভোজের সভায় লর্ড মিণ্টো প্রশ্ন করেন, "ডক্টর কেরী, আপনি কি মনে করেন না হিন্দুদের খৃষ্টান করা বা তার চেষ্টা করা ভুল?"

"না, না, আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। খৃষ্টান করানোয় আমাদের বিশ্বাস নেই। জোর করে ভণ্ড তৈরি করা যায় কিন্তু খৃষ্টান করা যায় না কখনো। আমরা সকলের বুদ্ধি ও বিবেকের কাছে সত্যকে তুলে ধরবার অধিকার চাই।"

লর্ড মিণ্টো বোঝেন যে, মিশনারীদের অন্তত শ্রীরামপুর মিশনারীদের থেকে মানুষের বিপদ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তবু ভয় পান।

ইতিমধ্যে ফেলিক্সের বিয়ে হয়েছে। মিশনের নানা কাজে ফেলিক্স অগ্রণী হয়েছেন। চীনে যাবার একটু সুযোগ হয়েও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না।

১৮০৭ সালে ব্রহ্মদেশের প্রচারক চেটার ফেলিক্সকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন সহকর্মীরূপে। প্রেসের নানা কাজে ফেলিক্স তখন বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছেন। পুত্রকে ছেড়ে দেওয়া কষ্টকর, তবু একটি নূতন দেশের পথ তার সামনে খুলে যাবে এতে বাধাও দিতে পারলেন না উইলিয়াম কেরী।

এক আশ্চর্য চরিত্র ছিল ফেলিক্সের। ধর্মপ্রচারকের নানা নীতির বাঁধনে বাঁধা জীবন থেকে মন চলে যেত দূরে—তার স্বভাবে কোথায় একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল নিয়ম-ভাঙ্গা বিশৃঙ্খলের প্রতি। তাই দূরের ডাক পেতেই ফেলিক্স চঞ্চল হয়ে উঠল। একাধিক ভাষায়

তার নিপুণতা স্বীকৃত, চিকিৎসা বিদ্যা তার আয়ত্ত, প্রেসের কাজে তার দক্ষতা বহু প্রমাণিত।

যাবার প্রাকালে উইলিয়াম কেরী ছেলেকে বললেন, 'বর্মী ভাষার অধ্যয়ন তোমার একমাত্র লক্ষ্য হক। প্রাণঢালা একাগ্রতা দিয়ে আয়ত্ত কর তাকে। উপরের ভাসা ভাসা জ্ঞানে খুশী হয়ো না। সাধারণ মানুষের কথাবার্তা ভাবভঙ্গী তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যেদিনই মনে হবে ভাষার মাটিতে পা পড়েছে তোমার, সেদিনই লিখতে শুরু কর সরল বর্মীয় ব্যাকরণ। মার্কের গসপেল অনুবাদ করবে—তবে খুব সাবধান, ভাষার ভাবভঙ্গী যেন ইংরাজী ঘেঁসা হয়ে না পড়ে।"

তখনকার দিনের সেরা ভাষাতাত্ত্বিক তাঁর নিজের সন্তানকে প্রাণভরে যে আশীর্বাদ করলেন তা সার্থক হয়েছিল। অর্থ নয়, মান নয়, সম্মান নয়। শিখে এসো ভাষা, লিখে এনো ব্যাকরণ। আর একটা গোপন কথা বললেন ছেলেকে—"বুঝে সুঝে চোলো, খরচপত্র যতদূর পার কমিয়ো—মিশনের পয়সা—'missionary funds are the most sacred on earth." ছেলের মেজাজ বাপের অজানা ছিল না।

শুধু পিতা কেরীকে নয়, পিতৃতুল্য ওয়ার্ডকে ছেড়ে যেতেও দুঃখিত হল ফেলিক্স। প্রথম প্রথম তার চিঠি আসতে লাগল--আশায় আনন্দে উজ্জ্বল। টীকা দেবার এক কৌশলেই মাত্ করে দিয়েছেন ফেলিক্স। ব্রহ্মদেশে ফেলিক্সই প্রথম টীকা দেওয়া শুরু করেন।

যখন ফেলিক্স আর চেটার এলেন বর্মায়—তাঁদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীরাও ছিলেন। যে মহদুদ্দেশ্য তাঁদের বর্মায় নিয়ে গেল তার সঙ্গে এই মহিলা দুটির কোন মনের যোগ ছিল না। প্রতিদিনের জীবন তাদের মেয়েলী ঝগড়ায় তিক্ত হয়ে উঠলো। কর্মক্লান্ত চেটার ও ফেলিক্স দিনান্তে ঘরে ফিরে যে অবস্থা দেখতেন তা প্রভু যীশুকে স্মরণে আনবার পক্ষে অনুকূল নয়। অবশেষে এই ঝগড়ার ছোঁওয়া

থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য চেষ্টায় ও ফেলিক্স তাঁদের দুজনকেই বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠালেন। মিসেস ফেলিক্স কেরী সম্বন্ধে ওয়ার্ড বলছেন যে তাঁর কোন মিশনারী সুলভ মনোভাব ছিল না "She did not like to be deprived of bread butter and meat."

ফেলিক্সের দৃষ্টি পড়ল বর্মার মানুষের দারিদ্র্যের প্রতি। ভগ্নপ্রায় বাড়ি, পথঘাটের পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই, পথে ঘাটে অভুক্ত মানুষের কংকালসার দেহ। খৃষ্টধর্ম প্রচারের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করলেন ফেলিক্স কেরী। সাধারণ মানুষের দৈন্যগ্রস্ত অবস্থা তাঁকে বিচলিত করল। এমন সময় ইঙ্গ-বর্মীয় যুদ্ধের কালো ছায়া পড়ল আকাশে। ফিরে আসতে হল প্রচারকদের। কিন্তু অবস্থা একটু শান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্স ফিরে গেল বর্মায়। আবার প্রাণঢালা কাজ শুরু হল। এবার বিশেষ করে ভাষা সম্পর্কীয়।

আর এক সমস্যা দেখা দিল—বর্মীভাষার কোন শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছিল না। নানা লোক ধরে আনা হতে লাগলো, কেউ প্রতিজ্ঞা করে আসে না, কেউ একদিন এসেই পালায়। ফেলিক্স যথারীতি ধৈর্যহারা হয়ে পড়লো। কেবলি মনে হতে লাগলো তার সমস্ত শক্তির অপচয় হচ্ছে।

দুঃসংবাদ এল কলকাতা থেকে—তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। ১৮০৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ফেলিক্স-পত্নী মার্গারেটের মৃত্যু হলো তখন তার বয়স উনিশ। পড়ে রইলো তিনটি শিশু লুসী, উইলিয়ম ও ডরোথি। মৃত্যুসংবাদে বিচলিত হয়ে ফেলিক্স যে বর্মা থেকে ছুটে পালিয়ে আসেন নি এতেই সবাই খুসী হলো। পিতৃতুল্য ওয়ার্ডকে ফেলিক্স লিখলেন—'O that I had more of the spirit of humble resignation" বেদনায় বুক ভরে গেলেও কর্তব্যে অটল ছিলেন ফেলিক্স কেরী। পিতাকে জানালেন, তাঁর নূতন আবিষ্কারের তত্ত্ব—পালি আর সংস্কৃতের নিকট আত্মীয়তা।

এমন সময়ে এক পরম দুঃসাহসের কাজ করে বসলেন ফেলিক্স কেরী। একদিন রুগী দেখতে চলেছেন ফেলিক্স, দেখলেন পথের ধারে ক্রুশবিদ্ধ একটি লোক মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। খৃষ্টান ফেলিক্সের অন্তর বিচলিত হল, ক্রুশবিদ্ধ মানুষ তার জন্মজন্মান্তরের সংস্কারে আঘাত করল। নিকটবর্তী রাজপ্রতিনিধির বাড়ির এক মহিলার চিকিৎসা উপলক্ষে ফেলিক্সের নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল। অসময়ে কারো প্রবেশের হুকুম ছিল না। ফেলিক্স কিন্তু তা মানলেন না। সোজা গিয়েই দাঁড়ালেন রাজপ্রতিনিধির সামনে। জানালেন প্রার্থনা—ওই হতভাগাকে মুক্তি দাও। কত অনুনয় বিনয় কিন্তু পাথর টলে তো রাজপুরুষের হৃদয় টলে না। এক শর্তে রাজপুরুষ রাজী হলেন। বেশ ছেড়ে দেব একে কিন্তু দ্বিতীয় কোন লোকের জন্য আর অনুরোধ করবে না। ফেলিক্স রাজী হলেন না। প্রাণভিক্ষা এমন শর্তে চাই না যাতে অন্য প্রাণের জন্য আবেদন করা যাবে না। অবশেষে এক শর্ত হল—ঐ রাজপুরুষের সঙ্গে আভায় যেতে হবে। মুক্তির আদেশ নিয়ে ফেলিক্স ছুটে এলেন ক্রুশের তলায়। কিন্তু সূর্যের তাপ তীব্রতর হয় বালুকণায়। প্রহরী তার গুপ্ত দক্ষিণা দাবী করে বসল। তাই সই। শেষ পর্যন্ত ফেলিক্স নামালেন সেই মৃতপ্রায় দেহাবশিষ্ট। বেলা ৩টে থেকে ৯টা পর্যন্ত ক্রুশবিদ্ধ ছিল সেই লোক। পুত্রের এই বিজয় সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল কেরী লিখছেন,

"Brother Chater says, he believes Felix was the only person in the place who could have succeeded and that he gained much renown among the Burman."

বর্মার রাজাকে মুগ্ধ করতে ফেলিক্সের বেশীক্ষণ সময় লাগল না। রাজধানী আভায় গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে ফেলিক্স তাঁর কাজের একটা খসড়া পরিকল্পনার কথা জানালেন। রাজা ফেলিক্সের সব কথাতেই রাজী। আভায় প্রেস হবে বর্মীভাষার ব্যাকরণ আর

অভিধান আংশিকভাবে ফেলিক্স তৈরি করে ফেলেছেন। কলকাতায় এসে সেগুলো ছাপবার ব্যবস্থা করে নিলেন। ১৮১৩ সালে উইলিয়াম কেরী একটি সম্পূর্ণ প্রেস পাঠালেন ফেলিক্সের জন্যে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন ফেলিক্স। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী মিস ব্লাকওয়াল ছিলেন জনৈক ইংরাজ নৌ সেনাধ্যক্ষ ও ব্রহ্মবাসিনী এক পর্তুগীজ মহিলার কন্যা। ২৩শে মে টীকা দেবার সরঞ্জাম প্রেস এবং নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে ফেলিক্স রেঙ্গুন থেকে আভায় যাত্রা করলেন।

কী বুকভরা আশা নিয়ে ফেলিক্স চলেছেন—কত স্বপ্ন, কত সাধ, কত আশা। ভবিষ্যতের কি উজ্জ্বল ছবি তাঁর চোখের সামনে। কিন্তু কে জানত আকাশ কালো হয়ে আসছে, শ্রাবণের মেঘ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। পূর্বভারতের সীমানা পার হয়ে পার্বত্য অঞ্চলের বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছে ইরাবতী, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ তার সর্বনাশা মূর্তি।

সেই ঝড়ো ঘুর্ণি হাওয়া নিমেষে তার চূড়ান্ত রসিকতার খেলা খেলে গেল।

বিস্ময়বিমূঢ় ফেলিক্স নিজেকে খুঁজে পেলেন ইরাবতীর তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে।

প্রাণপণে চেষ্টা করছেন স্ত্রী আর ছেলেদের বাঁচাবার জন্যে। উন্মত্ত ঢেউয়ের সঙ্গে মরণবাঁচন সংগ্রাম চলল কিছুক্ষণ। অবশ হয়ে এল সর্বাঙ্গ, শিথিল হয়ে এল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে গেলেন ফেলিক্স কেরী

কিন্তু সে তো মুহূর্তের দুর্বলতা—সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ফেলিক্স ভেসে উঠলেন। মনে হল ঐ তো অদূরেই ভাসছে তাঁর একটি শিশু। মনের ভিতর আবার আশার আলো জ্বলে উঠলো। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও ফেলিক্স ধরতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে তখন তীরের দিকে ফিরলেন। ঘাটের

মাঝিমাল্লারা তাঁকে তুলে নিয়ে গেল। ভগ্ন-হৃদয় ব্যর্থ-আশা ফেলিক্সের মনের অবস্থা ধরা রইলো উইলিয়াম কেরীকে লেখা একটি চিঠির মধ্যে। কি বেদনা তাঁর, কি বুকভরা হাহাকার—"আমার দুঃখ আমার সব সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যা কিছু ছিল সবই গেছে। যাক্‌গে সেসব। কিন্তু আমার একান্ত ভালবাসার যারা, আমার স্ত্রী আমার সন্তানদের মৃত্যু আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। কি যে বলবো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।" এ আঘাত উইলিয়াম কেরীর উপরেও প্রচণ্ডভাবে এসে লাগল। তাঁর অন্য সন্তান জ্যাবেজকে লিখছেন—"এই নিদারুণ দুঃখের সংবাদে আমরা অভিভূত হয়ে গেছি ·····নীরবে ফেলিক্সের জন্যে দুঃখ জানাচ্ছি আমি।"

সেই নিদারুণ দুর্যোগে বর্মী ভাষায় লেখা 'ম্যাথুর' উপদেশাবলী ভেসে গেল, বর্মী ভাষায় যে অভিধান ফেলিক্স লিখেছিলেন তাও ইরাবতীর গর্ভে আশ্রয় পেল।

উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ফেলিক্স কেরী পৌঁছলেন বর্মা দরবারে। সহৃদয়তার সঙ্গে রাজা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। অর্থনৈতিক সকল ক্ষতি পূরণ করে দিলেন।

সেই বছরের শেষে ফেলিক্স কলকাতায় এলেন। এবার মিশনের কাজে নয়, বাংলা ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনার তাড়ায় নয়, বর্মী সরকারের রাজদূত হয়ে। মিশনের কাজ ছেড়ে দিলেন তিনি। কলকাতায় এসে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই বাস করতে লাগলেন। মাথার উপর সোনার হাতল দেওয়া লাল সিল্কের জমকালো ছাতা, সোনার তলোয়ার সঙ্গে, পঞ্চাশজন বর্মী সহচর নিয়ে ফেলিক্স কেরী ঘুরে বেড়ান। বেশ মেজাজে থাকেন। কাজের কোন দায়িত্ব নেই, কারণ এত সব আয়োজন সত্ত্বেও কোন একটা চিঠিপত্রঘটিত গোলমালের জন্য রাজদূত বলে তাঁকে স্বীকার করল না ইংরেজ গভর্নমেণ্ট।

সাত মাস ধরে এই রাজকীয় চালে তিনি রইলেন কলকাতায়। ধারদেনা হল অনেক। ইরাবতী তাঁর জীবন থেকে অনেক মাশুল আদায় করল।

মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে গেল। নিজের জীবনে কোন কিছুর শাসন বা আকর্ষণ মানার মত মনের অবস্থা তাঁর নয়। লোকনিন্দায় তিনি নির্বিকার, পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন। ঝড় সইতে হল উইলিয়াম কেরীকে। পুত্রের দুর্ভাগ্যে তিনি যত দুঃখিত, তার ভগবানের পথ ছেড়ে সরে যাওয়ায় ততোধিক দুঃখিত। লিখছেন এক চিঠিতে—'ভগবানের পথ থেকে ফেলিক্সের এই সরে যাওয়া হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছে আমার।'

দেহে মনে আরও জীর্ণ আরও দুর্বল হয়ে ফেলিক্সকে ফিরে যেতে হল বর্মায়। এবারে আর সেই শান্ত সহৃদয় পরিবেশ নেই। সেই সাদর অভ্যর্থনা নেই। রাজার ক্ষিপ্ত মনোভাবের কথা শুনে ফেলিক্স পলাতক হলেন।

তারপর তিন বছর বর্মা ও আসামের বনে জঙ্গলে পাহাড়ে প্রান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত ফেলিক্স কেরী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

দুঃসাহসী কল্পনাবিলাসী মন তাঁর। গাছপালা চেনার আনন্দে নানা উদ্ভিদতত্ত্বের সন্ধান করলেন, নানা পাহাড়ীভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করলেন, এক পার্বত্য রাজার সেনাপতি হয়ে লড়াইও করলেন। ঘুরলেন কাছাড়, চল্লেন ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার মহারাজা তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে দরবারে রাখতে চাইলেন। মন বসল না সেখানেও। এই বিশৃঙ্খল, অনভ্যস্ত, ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা পিতা উইলিয়াম কেরীর চিঠি।

অবশেষে ১৮১৮ সালে চট্টগ্রামে ওয়ার্ড তাঁকে ধরে ফেরত পাঠালেন শ্রীরামপুরে। খেয়ালী জীবনের দিশেহারা দিনগুলির অবসান ঘটিয়ে পিতার আশ্রয়ে ফিরে এলেন তিনি। প্রত্যাগত

পুত্রকে ফিরে পেয়েই কেরী খুশী হলেন। সে যে ফিরবে কোনদিন এই ভরসাই প্রায় ছিল না। মার্শম্যান বলছেন: "……for several years he was entirely lost to the cause. He wandered among the independent provinces to the east of Bengal, and passed through a series of adventures by land and by sea, which would appear incredible even in a novel."

নূতন উৎসাহে কেরী কাজে লাগলেন। শ্রীরামপুর মিশনের নতুন লাইব্রেরী, নতুন মিউজিয়াম তৈরি হতে লাগল। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন চিরবিশ্বস্ত ফেলিক্স। প্রেসের কাজ তাঁর জানা, নানা ভাষায় তাঁর নিপুণতা, বহু বিষয়ে তাঁর কৌতূহল "the completest Bengali linguist amongst India's Europeans."

বাঁধনহীন জীবনের বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে তিনি যেদিন তাঁর পিতার আশ্রয়ে ফিরে এলেন সেদিনও কিন্তু তাঁর চরিত্রের মহত্ব একটুও কমেনি। খৃষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর সেই পুরনো একাগ্রতা না থাকলেও কর্তব্যে তাঁর নিষ্ঠা, সাহিত্যের কাজে তাঁর সাধনা, পিতার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ফেলিক্সের শেষ জীবন গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছিল। মাত্র চার বছর বেঁচেছিলেন ফেলিক্স। তারই মধ্যে লেখেন 'দিগ্‌দর্শন' পত্রের জন্যে বিজ্ঞানের প্রবন্ধ, হিন্দুস্থানের ইতিহাস, এবং ইংরাজী এনসাইক্লোপিডিয়ার অনুসরণে 'বিদ্যাহারাবলী'। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলছেন, "যাহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতিচমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কি প্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় সর্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনান্তর অন্য অন্য ইউরোপজাতীয় বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহাদিগের জ্ঞানবর্দ্ধনার্থে এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদি দেশেতে

ইউরোপীয় তাবদায়ুর্বেদশিল্পবিদ্যাদি বর্দ্ধনার্থে তাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জমা হইয়া ছাপা হইবেক।" এ ছাড়া ইংলণ্ডের ইতিহাস ও বিনিয়নের পিলগ্রিমস প্রগ্রেসের অনুবাদও ছাপা হয়েছিল।

১৮২২-এর ১০ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ডাক্তারদের পরামর্শমত তাঁকে চীনে পাঠান যায়নি। সকল সীমা পার হয়ে যাবার ডাক এসেছিল।

শ্রীরামপুরে ফিরে নিজেকে বলতেন 'প্রিজনার অব হোপ্'। কি আশার ছলনা তাঁকে ভুলিয়েছিল তাই বর্মা-আসাম-ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল থেকে গঙ্গাতীরের শান্ত শ্রীরামপুরের শ্যামলিমার মধ্যে তিনি ফিরে এসেছিলেন। মাত্র সাঁইত্রিশ তখন তাঁর বয়স। কি এক অদ্ভুত খেপামিভরা পাগল জীবন তাঁর অশান্ত, অপরিতৃপ্ত, ক্ষুব্ধ।

যোগ্য সহকর্মী পুত্রকে হারিয়ে উইলিয়াম কেরীর অন্তর কি বেদনায় ভরে উঠেছিল তা অনুমান করা অসম্ভব নয়।

১৮২৩ সালে লেখা তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন—

"The death of Felix was and still is much felt by me."

বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনার পুরোধা, বিশ্বকোষ রচয়িতা ফেলিক্স কেরী আজ পিতার কৃতিত্বের অন্তরালে চাপা পড়ে গেছেন।

সাত বছর বয়সে এ-দেশে এসেছিলেন, জীবনের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিরিশটি বছর আরও কাটালেন। বাংলা দেশ আর বাংলা ভাষা তাঁর নিজের হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে সাগরপারের বিদেশী সে কথা ভুলে তাঁকে আমাদের নিকটাত্মীয় মনে করবার সাহস তিনিই দিয়েছেন।

জেমস প্রিন্সেপ

মন ছিল বৈজ্ঞানিকের ; দৃষ্টি ছিল শিল্পীর। বর্তমানকে সুন্দর করে তোলার জন্ম ছিল সাধনা আর অতীতের বাণী অন্তরে পৌঁচেছিল গোপনে। সেই নিরলস বিজ্ঞান সাধক সেই সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন জেমস প্রিন্সেপ।

বিদেশী শাসনব্যবস্থা যে কটি ভারতপ্রেমিক সৃষ্টি করতে পেরেছিল জেমস প্রিন্সেপ তাদের অন্যতম। বাংলার নবজাগরণের সিংহদুয়ারে তাঁরা অর্ঘ্য বয়ে এনেছিলেন, পথ প্রশস্ত করেছিলেন—একটি মহান জাতির নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে পূর্ব দিগন্তের বাতায়ন খুলে রেখেছিলেন,—দীপ্ত সূর্যের প্রভাতী আশীর্বাদ যেন ব্যর্থ না হয়।

প্রাচীন ভারতের লুপ্ত গৌরবের দিকে যাতে দৃষ্টি ফেরে তারই নিরলস সাধনা পিছনে রেখে গেলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক, উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, উইলসন, জেমস প্রিন্সেপ।

১৭৯৯ সালের ২০শে আগষ্ট জেমস প্রিন্সেপের জন্ম। পিতা জন প্রিন্সেপ পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন, অল্ডারম্যান ছিলেন লণ্ডনের। ভারতবর্ষ ইটালি ও ইংলণ্ড জুড়ে বাণিজ্যের যে বিস্তৃত জাল তিনি ফেলেছিলেন তাতে প্রভূত ঐশ্বর্যের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে বৃটিশ বণিকদের ব্যবসার অবাধ সুযোগের জন্ম লড়াই করে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে সে অধিকার আদায় করতে পেরেছিলেন তিনি।

জেমস প্রিন্সেপের বাল্যশিক্ষা কোন সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত পথ ধরে চলেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজতিলক তাঁর ললাটে পড়েনি। মাত্র দুটি বছর একটি স্কুলে কাটলো—তারপর বালকজীবনে আর কোন শাসনের বা বিধিনিষেধের চাপ পড়লো না। ভাইবোন সংখ্যায়

অনেক। তাদের সঙ্গে গান গেয়ে আনন্দে দিন কাটতো। পড়াশুনা আর যা হলো তা বাড়িতেই হলো।

অল্প বয়সে যে দুটি বিষয়ের প্রবণতা তাঁর জীবনে দেখা গেল তা হলো সংগীত ও স্থাপত্য।

পরবর্তী জীবন প্রমাণ করছে যে তিনি ছিলেন জাত-শিল্পী। কল্পনা করতে পারি এক মানবসন্তানকে, মুক্ত প্রাণের আনন্দে ক্লিফ্‌টনের বিস্তৃত প্রান্তরে প্রান্তরে উদ্দাম আবেগে কণ্ঠভরা গান নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখছে দুটি অবাক বিস্ময়ভরা চোখে এই বিপুল পৃথিবীকে।

তখনও বালক মাত্র।

একটি ছোট গাড়ি তৈরি করেছিলেন নিজের হাতে। কি নিখুঁত ছিল দৃষ্টি। দরজা জানলা সবই ছিল বড় গাড়ির মত। আজও বালক প্রিন্সেপের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সেই গাড়ি তাঁর পারিবারিক বন্ধুরা সযত্নে রক্ষা করছেন।

কিন্তু বালক তো চিরকাল নাবালক থাকবে না। বয়স তো বাড়ছে। এদিকে পিতার ব্যবসা ধাক্কা খেয়েছে জোর। কিছু তো করতে হয়। শেখেনি কিছুই; কিন্তু বড় কাজ করবার জন্যে যাদের জন্ম তারা তো কাজ শেখেনি বলে থামে না।

ছবি আঁকায় হাত ছিল সুতরাং স্থাপত্য শিখলে কেমন হয়? তাই হলো। মনে করলেন জীবনের একটা ধারা পাওয়া গেল। নূতন উদ্যমে উইলকিন্স নামে এক ভদ্রলোকের কাছে শিখতে গেলেন কাজ। কিন্তু বাধা এলো অপ্রত্যাশিতভাবে। যন্ত্রের সূক্ষ্ম প্রয়োগ শিখতে গিয়ে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলো। প্রথম চেষ্টাতেই এই অসাফল্য আর এই আকস্মিক দৈহিক বিড়ম্বনা একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আবার কিছুকাল গেলো—জীবনের কোন উদ্দেশ্য স্পষ্ট নেই। কোন কাজ নেই। অবসন্ন কর্মহীন দিন চলতে লাগলো

একে একে। জন প্রিন্সেপ সুদীর্ঘকাল ব্যবসাসূত্রে জড়িত ছিলেন ভারতবর্ষের সঙ্গে। বহু চেনাশোনা, বহু পরিচিত লোক সেখানে। ঠিক করলেন মিণ্টের Assay বিভাগে একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া যায় ছেলের। সেই হিসাব করে লণ্ডনের রয়েল-মিণ্টে বিংলে সাহেবের কাছে জেমসকে পাঠালেন। অল্প দিনের মধ্যেই কর্মদক্ষতার প্রশংসাপত্র পেলেন আর তারই জোরে কলকাতার মিণ্টে 'এসে' মাষ্টার হবার কাজও জুটে গেল।

১৮১৯ সাল—

বিশ বছর বয়সে 'হুগলী' জাহাজে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন জেমস প্রিন্সেফ। অটুট সুন্দর স্বাস্থ্য, দৃষ্টিশক্তি চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ সুস্থ, মনে অদম্য উৎসাহ, বুকে অফুরন্ত আশা। কে জানতো সেদিন এই মিণ্টের মামুলী চাকরীর পিছনে ভারত তথা পৃথিবীর সভ্যতা একটা কতবড় সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এই বিশ বছরের যুবকের পথ চেয়ে আছে। কে জানতো যে ঠিক আরো বিশ বছর পরে কর্মক্লান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে মাত্র এক বছরের জীবন হাতে নিয়ে তিনি ফিরে আসবেন।

ইংলণ্ডের বিশ বছর তাঁর কেটেছে হাসিখেলায়, গানে, ভারতবর্ষের বিশ বছর কাটলো প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততায়, সাধনায় ইতিহাসের অজ্ঞাত রহস্য সাধনে।

সঙ্গে এল ছোট ভাই টমাস ইঞ্জিনীয়ারের কাজ নিয়ে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮১৯ সালে কলকাতায় এসে পৌঁছালেন জেমস প্রিন্সেপ।

কলকাতার মিণ্টে চাকরী করতে গিয়েই পরিচয় হলো হোরেস হেম্যান উইলসনের সঙ্গে। সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হিসাবে সুনাম তাঁর সুদূর প্রাচ্যে। কোন আশীর্বাদে এমন গুরুর সঙ্গে দেখা হলো কলকাতায়। সে প্রভাব ছড়িয়ে গেল তাঁর জীবনে তাঁর অন্তরে নতুন জগতের আলো জ্বেলে দিলে।

পরবর্তীকালে প্রিন্সেপের 'Essay on Indian Antiquity' যখন ছাপা হলো তখন সেই গ্রন্থের সম্পাদক এডওয়ার্ড টমাস তা উৎসর্গ করলেন হোরেস হেম্যান উইলসনকে। প্রিন্সেপের ভাই তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন "James Prinsep was appointed to serve under Dr now Professor H. H. Wilson then Assay Master of Calcutta and so formed an acquaintance which had great influence upon the pursuits of his after life.

নতুন মিণ্ট তৈরি হবার পরিকল্পনা চলছে তখন বারাণসীতে। উইলসন গেলেন সেখানে মিণ্ট শুরু করার প্রাথমিক কাজ করতে। প্রায় এক বছর সেখানে তাঁকে থাকতে হলো সেই অবকাশে অধিকতর কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করলেন জেমস।

বারাণসী থেকে উইলসন ফিরে আসার পর প্রিন্সেপকে পাঠানো হলো সেখানকার নতুন মিণ্টের ভার দিয়ে।

প্রিন্সেপ খুসী হলেন। বিশাল ভারতবর্ষকে দেখবার ও জানবার ব্যাকুলতা ছিল। তার কিছুটা তো মিটবে। স্থলপথ দিয়ে তাই গেলেন না। চল্লেন জলপথে গঙ্গাবক্ষে তখনকার দিনে অভিজাত সম্প্রদায় তাই করতেন। শিল্পী জেমসের ভিতরকার সুপ্ত মানুষটি পুণ্যপ্রবাহিনী গঙ্গার স্পর্শে জেগে উঠল। ছবি আঁকা বন্ধ ছিল কতকাল। আবার নেচে উঠলো হাতের আঙুলগুলো মনের ছবিকে কাগজে ধরে রাখতে। সে ছবিগুলো সযত্নে রক্ষা করছেন তাঁর পারিবারিক বন্ধুরা।

পুণ্যতীর্থ বারাণসী—পাশে চলেছেন মুক্তধারা সুরধুনী। সে কোন বিস্মৃত দিন থেকে বারাণসীর পথে ছুটে চলেছে মৃত্যুশঙ্কিত মানুষ—কোন পুণ্যার্জনের, কোন পাপস্খালনের উৎকণ্ঠিত আশায়। সেখানকার সুনীল আকাশ প্রতি সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের বন্দনামন্ত্রে ভরে

উঠেছে। মন্দির প্রকোষ্ঠের অলংকৃত প্রান্তদেশে সচকিত হয়ে উঠেছে সুখসুপ্ত পারাবত।

সেখানে এসে দাঁড়ালেন সাগরপারের মুদ্রাপ্রস্তুত বিশারদ জেমস প্রিন্সেপ। দেখলেন দেবতাই সর্বেসর্বা। যত মানুষ আসে সারা ভারত থেকে একমন্ত্র তাদের কণ্ঠে—বিশ্বেশ্বর মুক্তি দাও। বিশ্বেশ্বরের প্রাকার অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে—মানুষকে ছাড়িয়ে বিশ্বেশ্বর এত বড় হয়েছেন যে মানুষও নিজেকে ভুলেছে।

মন্দিরের বাইরে যে বারাণসী, কি বিশ্রী ছিল তার রূপ। পথঘাট বলতে কিছু নেই, খানা ডোবায় পরিকীর্ণ, রোগ ও অস্বাস্থ্যের কেন্দ্র। কেমন করে বাঁচে মানুষ—কে ভাবে সে কথা। বাঁচার জন্যে তো মানুষ আসে বারাণসীতে।

সুন্দরের উপাসক তিনি—মুদ্রাপ্রস্তুতের কাজটা জীবিকা সে তো জীবন সাধনা নয়। বারাণসীর পুণ্যভূমিতে সেই সুন্দরের উপাসকের উদ্বোধন হলো।

মিণ্টের জন্য যে নতুন বাড়ি হচ্ছিলো সেই বাড়ি দেখেই মেজাজ বিগড়ে গেলো প্রিন্সেপ সাহেবের। মিলিটারী ব্যারাক ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনীয়ারের উপর ভার ছিল বাড়ি তৈরির। মিণ্টটাও হচ্ছিল সেই ব্যারাক জাতের। সিধে খাড়া দেওয়াল, কোথাও কোন কারুকার্যের বালাই নেই।

একটা নতুন প্ল্যান তৈরি করলেন প্রিন্সেপ—মনের রং দিয়ে আবেগ দিয়ে, সৌন্দর্যবোধ দিয়ে। কলকাতায় লিখে পাঠালেন যে, যে টাকা খরচ হবে বলে ঠিক করা হয়েছে সেই টাকাতেই তিনি আরও ভাল বাড়ি করে দেবেন।

সৌভাগ্যই বলতে হবে কলকাতার কর্তৃপক্ষ রাজী হয়ে গেলেন। স্থাপত্যে তাঁর দক্ষতা প্রমাণের প্রথম সুযোগ মিললো বারাণসীর মিণ্ট তৈরির কাজে। সে কাজ সম্পূর্ণ হতে না হতেই আরও কাজের ডাক

এলো। একটা নতুন গির্জা তৈরি হবে। বিশ্বেশ্বরের পাশে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র যীশুখৃষ্টের আসন পাতা হবে। য়ুরোপীয় সমাজ তাদের একটি প্রার্থনাগৃহ নির্মাণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সেই কাজের ভার পড়লো প্রিন্সেপের উপর।

কিন্তু মুদ্রা নির্মাণ আর গৃহ নির্মাণে জেমস প্রিন্সেপের মন ভরে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে তাঁর মন। পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন, রসিক লোক জুটিয়ে সাহিত্যসভা বসান—সেই সাহিত্য সভার প্রচারের জন্য ছাপাখানা খোলেন।

অযাচিত ভাবে এই সময় সরকার থেকে একটা সুযোগের প্রস্তাব এলো। বারাণসীর উন্নতি করতে হবে—সুন্দর করো সহরটাকে—অর্থের জন্য ভেবোনা।

বাড়ি তৈরির চেয়ে বড় কাজ তো বটে। সহরকে সহর নতুন করে গড়ে তোলা।

পুরাকালের বারাণসী রোগগ্রস্ত রমণীর মত জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে পড়েছিল। তারই উপরে অস্ত্রোপচারের ভার নিলেন প্রিন্সেপ। শীর্ণ জীর্ণ দুর্গন্ধময়, অসূর্যম্পশ্যা পথগুলিকে কেটে কেটে বড় করা হলো যতদূর সম্ভব। পথের দুদিকে নালা কেটে জলনিকাশের ব্যবস্থা হলো—সহর থেকে গঙ্গার তলদেশ পর্যন্ত একটা বিরাট সুড়ঙ্গ দিয়ে সেই জলনিকাশের ব্যবস্থা পাকা হলো।

আজও সেই ব্যবস্থা ইঞ্জিনীয়ারদের বিস্ময় উদ্রেক করে—তাঁর কর্মকৌশলের নিপুণতা প্রমাণ করে। তারপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো ঔরংজীবের মসজিদের উচ্চচূড়ায়—চঞ্চল ভাগীরথীর তরঙ্গাঘাতে যার ভিত্তিমূল কম্পমান।

১৬৫৯ সাল। দিল্লীর শাহেনশা ঔরঙ্গজীব তাঁর বারাণসী ফর্মান জারী করলেন। তাতে বল্লেন নতুন মন্দির কোথাও গড়া চলবেনা কিন্তু পুরোনো মন্দিরও ভাঙ্গা হবে না। দশ বছর পরে ১৬৬৯ নতুন ফর্মান

জারী হলো ভাঙো মন্দির—বিধর্মীদের ধর্ম দমন করো—সেই ফর্মান চলে গেল প্রদেশে প্রদেশে—সোমনাথ, বিশ্বনাথ, মথুরায় কেশব দেবের মন্দির সেই ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তারপর একদিন দিল্লীশ্বর ঔরংজীবের নামে মসজিদ উঠলো গঙ্গার তীরে পুণ্যভূমি বারাণসীতে।

১৮৩২ সালে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন ভারত ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর বিদ্যার খ্যাতি তখন সুদূর ইংলণ্ডে পৌঁছে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সংস্কৃত ভাষার বোডেন অধ্যাপকের পদে আহ্বান জানালো। সে আহ্বান তিনি ফেরাতে পারলেন না।

ভারতবর্ষের অন্তরের বাণীকে সাধনার দ্বারা জেনেছিলেন—সেই বাণী নিজের দেশে পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি চলে গেলেন। পিছনে রেখে গেলেন তাঁরই শিষ্যস্থানীয় প্রিন্সেপকে।

উইলসন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্সেপের একসঙ্গে বহু কাজ বাড়লো। চাকরীর ক্ষেত্রে উইলসনের শূন্যপদ যেমন তাঁকে পূর্ণ করতে হলো, বাইরের সমাজ জীবনেও তাঁর কাজ উইলসনের ধারা সম্পূর্ণ করলো।

এসিয়াটিক সোসাইটির বহু দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিলেন। তাঁর gleanings তুলে দিলেন না কিন্তু সেই পত্রিকাকে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে পরিণত করলেন।

স্যার উইলিয়াম জোন্স, চার্লস উইলকিন্স, কোলব্রুক, উইলসন প্রভৃতি মনীষীর চেষ্টায় ভারতীয় পুরাতত্বের নানা দিক তখন আলোচনার জন্য খুলে গেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব তাঁদের মত সন্ধানীর চোখে ধরা না পড়ে পারেনি।

তাঁদের কাজের একটি সূত্র প্রিন্সেপ তুলে নিলেন।

প্রাচীন লিপি উদ্ধারই হলো তাঁর কাজ। অতীতের ভারতবর্ষ তার বাণী রেখে গেছে ভবিষ্যৎ কালের জন্য। পাহাড়ে পর্বতে মন্দির গাত্রে, মুদ্রায় লুকিয়ে আছে তার ইতিহাস অজানা লিপির আড়ালে।

ভারতের নানা দেশ থেকে তাঁর কাছে লিপি আসতে লাগলো পর্বত গাত্র কেটে শিলালিপি তুলে আনা হলো, ভগ্নাবশেষ প্রাসাদের সিংহদ্বারে উৎকীর্ণ লিপি, ভূমিদানের তাম্রলিপি তাঁর কাছে আসতে লাগলো পাঠোদ্ধারের জন্য। গভীর অভিনিবেশ সহকারে কাজে লাগলেন প্রিন্সেপ। সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্য খুব প্রগাঢ় ছিল না। তবু এই কাজে তাঁর অদম্য উৎসাহ, গভীর সাধনা তাঁর ঈপ্সিত ফললাভে সহায়তা করলো।

লিপি পাঠের এই দুরূহ কর্মে প্রিন্সেপের কৃতিত্ব ছাপিয়ে গেল তাঁর দুর্ধর্ষ পূর্বসূরীদের। দিল্লী এলাহাবাদের স্তম্ভ লিপির মর্মোদ্ধার করতে পারেন নি জোন্স, কোলব্রুক এবং উইলসনের মত মহা-পণ্ডিতেরা। যে পথ তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছে সে পথে পা বাড়াতে প্রিন্সেপ ভীত হলেন না। সেই লিপির অর্থ তাঁরই কাছে ধরা পড়লো। তারপর সেই লিপির সঙ্গে গুজরাটে গির্ণার লিপি, কটকের ধউলি লিপির যোগসূত্র খুঁজে বার করলেন।

গির্ণার লিপি পাঠ করে, তার অর্থ উদ্ধার করে জেমস প্রিন্সেপ চিরস্মরণীয় হয়েছেন। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ বার বার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে যে, যে বাণী প্রিয়দর্শী অশোকের সেই বাণী এক বিদেশী পান্থ আমাদের কাছে পৌঁছে দিলেন।

আশ্চর্য হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে দিল্লী এলাহাবাদের স্তম্ভ লিপির সাদৃশ্য আর গির্ণার ও ধউলির বিষয় বস্তুর সাদৃশ্য। তিনি বুঝলেন এগুলি—"series of edicts promulgated by Asoka." গির্ণার লিপিতে তিনি গ্রীক নরপতি অ্যান্টিওকাসের উল্লেখ পেলেন, এবং ইজিপ্টের টলেমীর উল্লেখ পেলেন। গ্রীক নরপতি অ্যান্টিওকাস অশোকের বন্ধু ছিলেন।

অ্যান্টিওকাস, গ্রীক নরপতি—তাঁর উল্লেখ অশোকের লিপিতে কেমন করে এল। দূর সিন্ধুপারের ঐ নরপতির কথা জানবার

কি উপায় অশোকের ছিল। এর উত্তর দিলেন প্রিন্সেপ, অশোকের যে মহিমা সম্বন্ধে মন সংশয়াচ্ছন্ন ছিল কারো কারো তাদের দ্বিধা ঘুচিয়ে জোরের সঙ্গে প্রিন্সেপ বললেন—"I am now about to produce evidence that Asoka's acquaintance with geography was not limited to Asia, and that his expansive benevolence towards living creatures extended, at least in intention to another quarter of the globe; that his religious ambition sought te apostolize Egypt."

লিপি উদ্ধৃত করে দেখালেন—"এখানে ও বিদেশে, যেখানে তাঁর ধর্ম পৌঁচেছে সেখানেই দেবানাপিয়ের ধর্ম চলছে।" আর একটি তর্কের নিরসন করলেন প্রিন্সেপ। টার্ণারই প্রথম প্রিয়দর্শী আর অশোককে একই লোক বলে ঘোষণা করলেন। সে কথা মানলেন না অনেকে। সাধারণ লোক না মানলে কিছুই ক্ষতি ছিল না। কিন্তু উইলসন সাহেব বল্লেন যে অশোকই যে প্রিয়দর্শী এর তো কোন প্রমাণ নেই।

উইলসন সাহেব যুক্তি দেখালেন যে গির্ণার বা পউলির কোন লিপিতেই বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের কোন উল্লেখ নেই সুতরাং এ রাজার ধর্মমত কি, এরা বুদ্ধের ভক্ত কিনা তা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অশোকই যে প্রিয়দর্শী তা কে বলবে।

প্রিন্সেপ লিখলেন—"We may stop short of absolute and definite proof that Asoka enunciated his edicts under the designation of Priyadarsi the beloved of the Gods, but all legitimate induction tends to justify the association which is contested by no other inquirer."

টার্ণার, লাসেন, বুর্ণফ, কানিংহাম, মুলার প্রভৃতি পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকেরা তখন একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে অশোক আর প্রিয়দর্শী একই লোক।

শুধু ভারতের ইতিহাসে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নতুন পাতার সন্ধান পাওয়া গেল। যে ভারতীয় সভ্যতার গর্বে উৎফুল্ল হয়ে আজ আমরা শতকণ্ঠ, যার মহিমায় পাশ্চাত্যের জড়বাদের প্রতি আমাদের উন্নাসিক ঘৃণার শেষ নেই সেই সভ্যতার পুনরুদ্ধারের প্রধান চেষ্টাটা ঐ জড়বাদী পাশ্চাত্যের কয়েকটি দুঃসাহসী মানব সন্তানের। বিস্মৃতির মোহজাল লুপ্ত করে রেখেছিল যে মহৎ প্রাণের উদার প্রচেষ্টাকে তাকে বিশ্বের সকলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করলেন মুদ্রাবিশেষজ্ঞ জেমস প্রিন্সেপ।

"অশোকের সেই মহাবাণী কত শত বৎসর মানব হৃদয়কে বোবার মত কেবলই ইশারায় আহ্বান করিয়াছে। পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রবেগে দিগদিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্রদ্বীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই—তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল, তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী দ্রুয়িদগণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তর স্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন।" (রবীন্দ্রনাথ)

১৮৩২ থেকে '৩৮ জেমস প্রিন্সেপ এই কাজে মেতে রইলেন। মধ্য এসিয়ার নানা জায়গায় তখন য়ুরোপের ঘর ছাড়া পথিকের দল বেরিয়ে পড়েছে। তাদের পথ চেয়ে বুঝি বসেছিল ইতিহাস—কত মরা গ্রামের কঙ্কাল খুঁজে পেলো তারা, মাটির বুক চিরে উদ্ধার করলো পূর্বকথা, পেলো প্রাচীন সভ্যতার বার্তাবাহী মুদ্রা।

সেই সব মুদ্রা কলকাতায় চলে এলো।

তার অর্থ উদ্ধারের কাজ প্রিন্সেপ ছাড়া আর কেই বা করে।

এশিয়াটিক সোসাটির জার্ণালে মুদ্রার ছবি আর পরিচয় বেরুলো অসংখ্য। মূক অতীতের মুখরতা শুধু জেমস প্রিন্সেপের কাছেই ধরা পড়লো।

কিন্তু যা অনিবার্য তা ঘটলো বড় তাড়াতাড়ি। প্রচণ্ড প্রাণঢালা পরিশ্রমে দেহ ভেঙ্গে পড়লো। অসুস্থতা হঠাৎ একদিন প্রবলদর্পে শরীরকে আচ্ছন্ন করলো।

মস্তিষ্কের গোলযোগ বলে সন্দেহ করলেন চিকিৎসকেরা। বন্ধু ও আত্মীয়েরা ১৮৩৮-এর অক্টোবর মাসে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন—সুচিকিৎসা ও বিশ্রামের আশায়। মাত্র একটি বছর কোন রকমে কাটালো, তারপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দীপ্তি নিভে গেল একদিন ২২শে এপ্রিল ১৮৪০।

প্রায় বিশ বছর বয়সে এসেছিলেন—আর বিশ বছর প্রায় রইলেন ভারতে। সহজ আনন্দে, উচ্ছল মত্ততায়, নারীসম্ভোগের অবাধ সুযোগ গ্রহণে দিন কাটতে পারতো যা তখনকার অনেক বিদেশীরই কেটেছে। কিন্তু ইতিহাসের সন্ধানে বিজ্ঞানী মন আর সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ভারতবর্ষের এক নতুন পরিচয় তিনি পৃথিবীর কাছে দিয়ে গেলেন। ১৮৩৫-এ তিনি বেঙ্গল আর্মির কর্ণেল অবটের মেয়েকে বিয়ে করেন—তাঁর নাম হ্যারিয়েট। কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবনের ধারাবাহিকতা রাখতে গিয়ে এই তথ্যটাই দিতে ভুলেছি। একটি শিশু কন্যাও তাঁদের ছিল।

যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁদের সাক্ষ্য প্রমাণ করছে যে কোন প্রকার দীনতা, সংকীর্ণতা, মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সংসারে যাঁরা তার চেয়ে অল্প অধিকার পেয়েছে তাদের জন্য তাঁর সমবেদনার শেষ ছিল না। নিজের ত্রুটি স্বীকারে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হতো না। অন্যের কৃতিত্বে তাঁর মুখে যে আনন্দের আভা দেখা দিতো তার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না একটুও।

১৮০০ সালে ডক্টর ফ্যালকণার প্রিন্সেপ সম্বন্ধে লিখছেন,— "Never was a mind more free from the paltry and mean jealousies which sometimes beset scientific men."

গঙ্গার তীরে বিদেশী জাহাজ যেখানে এসে নোঙর ফেলতো, যেখানে ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করতো অন্য দেশের মানুষ সেখানে তাঁর স্মরণে তৈরি হলো প্রিন্সেপ ঘাট। ভারতের ইতিহাসে অশোকলিপির সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে রইলো তাঁরই নামাঙ্কিত ঘাটে নামবে বিদেশের মানুষ। তারা জানবে এক বিদেশী এই দেশের পুরোনো ইতিহাসের ধারা সন্ধান করে এদেশের ভালবাসা পেয়েছেন —আর জানবে এই ভারতবর্ষের মহাতীর্থে, তার শ্যামল প্রান্তরের আর দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের নীলিমার নীচে, কলপ্রবাহিনী ভাগীরথীর তীরে তীরে তাদের চিরকালের নিমন্ত্রণ আছে। এখানে শুধু পণ্যতরীর আনাগোনা নয়, মানুষের হৃদয় এখানে ঘাটে ঘাটে ঘুরছে মানুষকে জানবার জন্য।

আজ যখন বিদেশীদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি নির্বিচার হয়ে উঠছে—সরকারী দপ্তরখানার ভারী বুটওলা সাহেবের স্মৃতি যখন আর সব ছাড়িয়ে উঠছে তখনই মনের মধ্যে সেই অনুত্তর চল্লিশ সত্যসন্ধানীর ছবি কল্পনা করে নিই।

যখন সমস্যা কণ্টকিত জরাজীর্ণ মানুষ নিজের মধ্যে নানা খণ্ড বিভেদের বেড়া তুলছে তখন গঙ্গাতীরে ঐ ঘাটের নীচে অস্তোন্মুখ সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাই—প্রিয়দর্শীর সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে থাক—ক্ষণকালের বিভ্রান্তি ছাপিয়ে আমাদের ভালবাসা তোমায় স্পর্শ করুক।

জোশুয়া মার্সম্যান

উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে যে একদল কর্মী বাংলাদেশে এক শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন করলেন, বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নব প্রাণ দিলেন, সমাজসেবার কেন্দ্র গড়লেন শ্রীরামপুরে, জোশুয়া মার্সম্যান সেই কর্মীমণ্ডলের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। দীর্ঘ আটত্রিশ বছর তিনি বাংলাদেশে ছিলেন। এখানকার জীবন এখানকার সমস্যা তাঁকে ভাবিয়েছে—দূর গ্রামাঞ্চলে প্রবাহিত জীবনধারার বহু তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে ছিল—সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে সংস্কার মুক্ত করে প্রভু যীশুর করুণাবাণী প্রচার করবেন এই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। মার্সম্যানের ভারতসাধনার পরিচয় তাঁর কর্মে—জোন্স, উইলকিন্স, কোলব্রুক প্রভৃতির মত ভারতীয় শাস্ত্র বা সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় অধিকার কোনদিনই ছিল না কিন্তু সাধারণ মানুষ তার সুখ দুঃখ, তার জীবনযাপনের শান্ত নিরুৎসুক প্রবাহ তাঁকে স্পর্শ করেছিল। শ্রীরামপুর মিশনের সকল শুভকর্মের সূত্রপাতে আছেন মার্সম্যান যেমন আছেন কেরী ও ওয়ার্ড। সর্বোপরি বাংলা সাময়িকপত্রের তিনিই জন্মদাতা।

অখ্যাত পরিবারে জোশুয়া মার্সম্যানের জন্ম—উইলসায়ারে ওয়েস্টবেরী লে একটি ছোট্ট গ্রাম—সেই গ্রামে ১৭৬৮ সালের ২০শে এপ্রিল। শোনা যায় তাঁর কোন এক পূর্বপুরুষ ক্রমওয়েলের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্য সব পরিচয় বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে।

জোশুয়া মার্সম্যানের পিতা কাজ করতেন নৌবাহিনীতে। আশ্চর্য সাহস ছিল তাঁর আর ছিল অনমনীয় দৃঢ়তা চরিত্রের। বিভিন্ন নৌ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাঁর তারুণ্যের দিনগুলি কেটেছে উত্তেজনার মধ্যে। কুইবেক দখলের যুদ্ধই তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ।

তারপর ইংলণ্ডে ফিরে গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করার উদ্দেশ্যে তিনি ফিরে আসেন। সংসার শুরু হলো নতুন বিয়ে করা বৌকে নিয়ে। তন্তুবায়ের ব্যবসা তাঁর ভাল লাগতো। সংসারে আনন্দের প্রবাহ বইয়ে দিয়ে পুত্র মার্সম্যানের আবির্ভাব।

বলাবাহুল্য ওয়েস্টবেরী লে'র তন্তুবায় পিতা তাঁর পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দেবার অভিলাষ মনে মনেই পোষণ করলেন। তার কারণ উচ্চ-শিক্ষার ব্যয় বহণের সাধ্য ছিলনা তাঁর। নিজেই ছেলেকে কাছে ডেকে নিয়ে খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বের মূল নীতিগুলি শেখাতেন। সৌভাগ্য তাঁর, পরবর্তীকালে পুত্রের মিশনারী কার্যকলাপের মধ্যে নিজের শিক্ষাকে ফলবতী হতে দেখবার মত দীর্ঘ আয়ু তিনি পেয়েছিলেন।

বালক মার্সম্যানের পড়াশুনায় ঝোঁক ছিল প্রবল। তিনি নিজেই বলেছেন যে আঠারো বছর বয়সেই তাঁর পাঁচশো বই পড়া হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের যত বই সব তাঁর পড়া হয়ে গেলে, দশবারো মাইল পথ হেঁটে দূর দূর জায়গা থেকে বই সঞ্চয় করতেন। বিদ্যার অকূল সমুদ্রে পথ দেখাবার মত কেউ তাঁর ছিল না। ফলে বাঁধাধরা পড়াশুনা তাঁর হয়নি, যা পেয়েছেন তাই পড়েছেন। তবে মনের প্রবণতা ছিল জীবনী সাহিত্যে, ইতিহাসে। বয়স্ক লোকেদের তাক লাগিয়ে দিতেন তাঁর আশ্চর্য স্মরণশক্তি দিয়ে।

একদিন পথের ধারে ব্যলক মার্সম্যান বন্ধুদের নিয়ে খেলায় ব্যস্ত। এমন সময় পার্শ্ববর্তী সহরের এক পাদরী সাহেব চলেছিলেন পথ দিয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মুখশ্রী বালক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি বালককে কাছে ডেকে প্রশ্ন জিগ্যেস করতে লাগলেন। প্রশ্ন চলতে চলতে দেখা গেল প্রত্যেকটিরই সঠিক উত্তর তার জানা। তখন প্রাচীন ইংলণ্ডের ইতিহাস থেকে প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে লাগলেন সেই পথচলতি পাদরী কিন্তু হায় প্রভূত-পঠনের ব্রহ্মাস্ত্র বালক মার্সম্যানকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে রেখেছে যে একটি বাণও বিঁধলো

না—প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক জবাব পেয়ে বিস্মিত ধর্মযাজক চলে গেলেন।

বালকের মনের প্রবণতার দিকদর্শনে পিতা বুঝতে পারলেন যে তন্তুবায়ের পেশা এর পোষাবে না। এমনি সময়ে সেই গ্রামের মিস্টার কেটরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো। লণ্ডনে কেটরের বইয়ের দোকান ছিল। কেটর গ্রামবাসীদের কাছে শুনলে যে একটি যুবক সব বই পড়েছে আর সংসারের সব সে জানে। কেটর আলাপ করলেন মার্সম্যানের সঙ্গে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন—দেখলেন যা শুনেছিলেন তা মিথ্যা নয়। তিনি বললেন, চলো ইংলণ্ড বইয়ের দোকানে কাজ দেব তোমাকে। তরুণ মার্সম্যানের তখন পনেরো বছর বয়স। উৎসাহে আনন্দে তিনি তখনই রাজী হয়ে গেলেন। তাঁর পিতাও বুঝলেন যে এই কাজই তাকে মানাবে। সকালবিকেল সুতো বুনতে বুনতে নইলে মারা যাবে মনটা। প্রস্তাব পাবার তিন দিনের মধ্যেই তিনি লণ্ডনে গিয়ে হাজির।

লণ্ডনের দিনগুলি মার্সম্যানের জীবনে যেমনি মজার তেমনি দুঃখের। তাঁর কাজ ছিল বইয়ের দোকান থেকে বই নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। এতে ফল হলো এই যে সে বই সব যথাযোগ্য স্থানে যথাসময়ে পৌঁছাত না। দেখা যেত পার্কে বসে বা পথের ধারে বসে কাজ ভুলে মার্সম্যান বই পড়ছে। প্রথম প্রথম কেটর লোক ডেকে এনে দেখাতো তার দোকানে কি রকম আশ্চর্য লোক আছে যে সমস্ত বই এবং লেখকের নাম মুখস্ত বলতে পারে। কিন্তু হায়, কাজ যে কিছুই হয় না মার্সম্যানকে দিয়ে। কারণ নয় নয় করেও অনেকটা পথ রোজই মার্সম্যানকে বই ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াতে হতো। প্রতিদিন রাত্রে দেখা যেতো যে গভীররাত পর্যন্ত বই কোলে করে আপন মনে তার সময় কাটছে। মধ্যরাত্রে দেখা যেতো ঘুমন্ত মার্সম্যানের কোলে খোলা বই পড়ে আছে আর প্রদীপ জলছে তখনো।

কিন্তু বেশীদিন সেখানে থাকা হলোনা। স্নেহশীল পিতা পুত্রকে ছেড়ে থাকতে পারছেন না। গ্রামে ফিরে গিয়ে মার্সম্যান এবার সত্যি সত্যিই তাঁত বুনতে শুরু করে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দ, পাঠ্যঅপাঠ্য যা পেলেন পড়তে লাগলেন। ধর্মপুস্তকে ঝোঁক পড়ল তাঁর। যেখানে যা ধর্মগ্রন্থ পেলেন শেষ করতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো লাটিন শিক্ষা।

তেইশ বছর বয়সে ১৭৯১ সালে হানা সেফার্ডকে তিনি বিয়ে করলেন। এর পর ছেচল্লিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন—দাম্পত্য জীবনের শান্তি, স্ত্রীর নম্রমধুর সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যবহার তাঁর বহু ক্লান্ত মুহূর্তকে সুধায় ভরে দিয়েছে। হানা মার্সম্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছে "fitted in every respect to be an associate in the great undertaking to which the life of her husband was devoted."

এমন সময় খবর এলো যে ব্রিস্টলে চার্চস্কুলের শিক্ষক চাই। বেতন অবশ্য খুবই কম তবে গৃহশিক্ষকতার দ্বারা সে অভাব পূরণ করার সুবিধা দেওয়া হবে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিস্টলে চলে গেলেন। স্কুলের সময়ের বাইরে নিজের স্কুল খুললেন "This seminary was soon crowded with pupils, it rose rapidly in public estimation and placed him at once in circumstances of independence." ব্রিস্টলে তাঁর সবচেয়ে বড় লাভ হলো ব্রিস্টল একাডেমীর প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাইল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি নিজে ব্রিস্টল একাডেমীর ছাত্র হলেন। ছটি বছর একদিকে শিক্ষকতা অন্যদিকে একাডেমীর ছাত্রহিসাবে গ্রীক, হিব্রু, আরবী ও সিরিয়াক ভাষার অধ্যয়ন চলতে লাগলো।

এমনি সময়ে ভারতবর্ষ থেকে লোক চেয়ে পাঠাচ্ছেন উইলিয়াম কেরী। তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন যে বিরাট সুযোগ

ছড়ানো রয়েছে, হাজার হাজার মিশনারী এলেও কাজ ফুরোবে না। ব্যাপ্টিস্ট মিশন কেরীর সাহায্যের জন্য লোক সন্ধান করছিলেন। মিশনের তথ্য-বিবরণীতে মার্সম্যান ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষে মিশনের কাজের কথা পড়েছিলেন। তাঁর ধ্যানে ভারতবর্ষের কল্পমূর্তি একটা গড়া ছিল। ডক্টর রাইল্যাণ্ড যেদিন মার্সম্যানের কাছে প্রস্তাব করলেন সেদিনই দেখলেন যে দূরদূরান্তে মিশনের কাজে যাবার জন্য মার্সম্যান প্রস্তুত হয়েই আছেন "Dr. Ryland proposed the subject to his pupil and found that it was not altogether new to his mind." উৎসাহী লোক আরও মিলিত হলেন এসে। গ্রাণ্ট, ব্রাণ্ডসন আর ওয়ার্ড তাঁদের স্ত্রীপুত্র সমেত যেতে রাজী হলেন।

ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজত্ব মিশনারীদের কার্যকলাপে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক যথারীতি বাধা দিতো। সুতরাং ব্যবস্থা হলো ড্যানিশ অধিকৃত শ্রীরামপুরেই আপাততঃ এই চারটি পরিবার উঠবে তারপর কেরীর সঙ্গে দেখা হলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে।

আমেরিকান জাহাজ 'Criterion'-এ ২৯শে মে ১৭৯৯ সালে চারটি পরিবার চল্লো অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ধর্মপ্রাণ আমেরিকান খৃষ্টান। তাঁরই বন্ধুত্বে এঁদের জাহাজের কোন কষ্টই সইতে হলো না। ১৩ই অক্টোবর শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছলেন মার্সম্যান তাঁর দলবল নিয়ে। নতজানু হয়ে শ্রীরামপুরের গঙ্গাতীরে তিনি সেদিন পরম করুণাময় যীশুর কাছে কোন্ প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—তাঁর বন্ধু ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তা না সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে আলোকবর্তিকা তুলে ধরার শক্তি।

মার্সম্যান ও ওয়ার্ড পরিচালিত এই ছোট্ট দলটি সেদিন একটি রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তখন ফরাসী আক্রমণের ভয় ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসকদের মনের মধ্যে প্রবল, চতুর্দিকে তাঁরা ফরাসী গুপ্তচরের ভূত দেখছেন। এমন সংবাদ সরকারী

মহলে ছিল যে ফরাসীরা মিশনারীর বেশ ধরে ভারতবর্ষে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে আসছে। কলকাতার একটি কাগজে খবর বেরুলো যে চারজন পোপ প্রেরিত মিশনারী ক্যাপ্টেন উইকসের Criterion জাহাজে ভারতবর্ষে এসেছে। লর্ড ওয়েলেসলীর কানে এখবর পৌঁছালো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন যে ঐ চারজন মিশনারীকে পুলিশের কাছে হাজিরা দিতে হবে নইলে জাহাজ আটক করা হবে। শ্রীরামপুরের গভর্ণর তখন কর্ণেল বাই। সাহসী ও তেজস্বী ও কর্ণাল বাই নিতান্ত ক্ষুদ্র শ্রীরামপুরের শাসনকর্তা হয়েও আশ্রয় প্রার্থীদের কখনো কোম্পানীর ভয়ে কোম্পানীর হাতে তুলে দেননি। "He had uniformly resisted the demand of successive Governor Generals for the surrender of those to whom he had given the protection of his flag." ইতিমধ্যে অবশ্য ওয়েলেসলী জানতে পারলেন এই মিশনারীরা কারা। মিশনারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল, তিনি জাহাজ ছাড়বার আদেশ দিলেন।

যে কঠিন কাজের ব্রত নিয়ে এই কয়েকটি উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ভারতে এলেন তার মূল্য প্রথম থেকেই দিতে হলো। ৩১শে অক্টোবর অল্প-কয়েকদিনের জ্বরে গ্রাণ্টের মৃত্যু হলো। অপরিচিত দেশ, বিরূপ তার শাসকবর্গ, তারই মধ্যে এই বন্ধুবিচ্ছেদ কি বেদনাকর।

আশা-নিরাশার জোড়া সুতোয় বোনা জীবনের জাল। গ্রাণ্টের মৃত্যুর আঘাত সইতে না সইতে খবর এলো যে ইংরাজ ভারতে কোনমতেই মিশনারীদের থাকতে দেওয়া হবে না। ছাপাখানা রাখতে দেওয়া হবে না—মিশনারী হিসাবে প্রবেশ করলেই ধরে ইংলণ্ডে ফেরত পাঠানো হবে। এরই পাশে পাশে আশার আলো এলো—শ্রীরাম-পুরের গভর্ণর বাই ৬ই নভেম্বর নিজে এসে জানিয়ে গেলেন যে যতদিন তাঁরা শ্রীরামপুরে থাকবেন ততদিন ততদিন ইংরাজ সরকারের কাজ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। "He assured them that

under the protection of the Danish crown they would have nothing to fear from the opposition of their own Government." তিনি ভরসা দিলেন—খুলুন ছাপাখানা, খুলুন স্কুল ; ড্যানিশ নাগরিকতার ব্যবস্থাও হবে। আরও বল্লেন যে শ্রীরামপুরের চার্চটাও তিনি মিশনারীদের হাতে তুলে দেবেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরী তাঁর খিদিরপুরের নীলকুঠি পিছনে ফেলে এসে যোগ দিলেন মার্শম্যান-ওয়ার্ডের সঙ্গে। আশ্চর্য মনের মিল ঘটলো কেরী মার্শম্যান আর ওয়ার্ডের। এই তিনজনের মিলিত সাধনা আর পরিশ্রমের উপর শুধু শ্রীরামপুর মিশন দাঁড়িয়ে নেই, বহু মঙ্গলকর কর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছেন তাঁরা। তাঁদের এই নিবিড় হৃদয়গত ঐক্য সম্বন্ধে বলা হচ্ছে "So complete was the unity of their designs that it seemed as if three great souls had been united in one, so as to have but one object and to be imbued with one impulse."

অর্থনৈতিক সমস্যার কথাটাই বড় হয়ে দেখা গেল। যে টাকা ইংলণ্ড থেকে আসবে সে তো নিতান্তই অল্প। ওয়ার্ড গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন কেরীর প্রেস—প্রেস চালু না হলে বাংলায় নিউ টেস্টামেণ্ট ছাপা হবে না। মার্শম্যান আর মিসেস মার্শম্যান ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে বোর্ডিং স্কুল খুলে ফেললেন মিশনের অর্থাগমের কথা মনে রেখে। প্রথম মাসেই স্কুল থেকে পাওয়া গেল একশো টাকা। বছর ফুরোতে না ফুরোতেই দেখা গেল মাসিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ তিনশো টাকা। সে স্কুলের খ্যাতি ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। তরুণ বয়সের প্রগাঢ় অধ্যয়নের ফসল ফলতে লাগলো এতদিনে।

রামবসুর সঙ্গে মার্শম্যানের দেখা হলো শ্রীরামপুরে—রামবসুই প্রথমে টমাস পরে কেরীর সঙ্গে থেকে সাহেবদের উদ্দেশ্য বুঝেছিলেন। নিজে খৃষ্টান না হলেও সাহেবদের উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর কোন অসদ্ভাব

ছিল না। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। খৃষ্ট ভজনার গান রচনার দ্বারা তিনি সাহেবদের প্রিয় হয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন তিনি সাহেবদের তোষামোদ করার জন্য বা কৌতুক করে ভক্তি দেখাতেন। কিছু কৌতুকপ্রিয়তা থাকতে পারে না এমন নয় কিন্তু সুদীর্ঘকালের সঙ্গ যে আন্তরিকতার দাবী করে সে আন্তরিকতা না অনুভব করার মত অগভীর চিত্ত মানুষ রামবসু বোধ হয় ছিলেন না। তিনি খৃষ্ট উপাসনায় যোগ দিতেন কিন্তু সংসার ছেড়ে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে খৃষ্টান হতে পারবেন না এ কথাও স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন। মার্সম্যানের ভাল লেগেছিল রামবসুকে। তিনি যে অন্ধকার ছেড়ে আলোয় আসতে পারবেন না এই কথা মনে করে মার্সম্যান দুঃখ বোধ করতেন, খৃষ্টের শরণ নিতে গেলে যে বন্ধন মুক্ত হতে হয়! "All the ties that twine about the heart of a father, a husband, a child, a neighbour must be torn and broken before a man can give himself to Christ."

ইতিমধ্যে মার্সম্যান বাংলা বলতে শুরু করেছেন—১৮০০ সালের ১লা অক্টোবর তিনি প্রথম বাংলায় বক্তৃতা করলেন। তবে তাঁর সহকর্মী কেরীর মত সহজ স্বচ্ছ বাচনভঙ্গী, চলতি বাংলার উপর অধিকার তিনি কোনদিনই বেশ ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেন নি "Mr. Marshman's knowledge of the coloquial tongue, however, never equalled that of his colleague, who used it with a degree of fluency and point which has seldom been attained by a foreigner."

এমনি করে যখন স্কুল আর মিশন নিয়ে মার্সম্যানের দিন কাটছে শ্রীরামপুরে তখন ১৮০২ সালে জুলাই মাসের শেষে যশোর থেকে মোরাদ নামে একটি লোকে শ্রীরামপুরে এসে জানালে যে যশোরের কয়েকজন লোক তাকে পাঠিয়েছে মিশনারীদের যশোরে নিয়ে যাবার

জন্য। মার্শম্যান তৎক্ষণাৎ ছুটলেন যশোরে। সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান তাঁদের অভ্যর্থনা করলো। সেখানে উৎসাহ পেয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গোবরাপুরে গেলেন। সেখানে ব্রাহ্মণেরা দল বেঁধে অপেক্ষা করছিলেন। মার্শম্যানকে তাঁরা কোন কথাই বলতে দিলেন না। মার্শম্যান ছাপা প্রচারপত্র দিলেন—তা তাঁরা তাঁর সামনেই ছিঁড়ে ফেললে। সেখান থেকে গেলেন গড়পাতা—সেখানে জাতিচ্যুত হিন্দু-মুসলমানের দল সাদর সম্বর্ধনা জানালো। যে অনাদর ও লাঞ্ছনা তারা নিজের জাতের লোকদের কাছে পেয়েছে তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই তারা ব্যাগ্র হয়ে উঠেছিলো। উৎকণ্ঠিত উৎসুক হৃদয়ে তারা মার্শম্যানের কথা শুনতে লাগলো। তিনি লিখছেন "I never saw any Hindus except in the family of Krishnu, listen to the gospel like these people. Their affectionate conduct to me I never saw exceeded even by brethern in England." ফেরবার পথে চাঁড়ুরিয়া গ্রামে শিবরাম দাস নামে এক মূর্তিপূজা বিরোধী গুরু তাঁকে আহ্বান করলেন। খোলা মাঠে গাছের ছায়ায় মার্শম্যান গুরুর শিষ্যদের কাছে খৃষ্টবাণী প্রচার করে ফিরে এলেন শ্রীরামপুরে।

পরের বছরে মে মাসে খবর এলো যশোরে দেশী খৃষ্টান ভরত ঘোষের উপর নানাধরনের অত্যাচার হচ্ছে। জনৈক সরকারী কর্মচারী, অবশ্যই হিন্দু, ভয় দেখিয়েছে যে হয় নতুন বিশ্বাস ত্যাগ করে এবং তার সঙ্গে ফাইন দিয়ে ভরত ঘোষ গ্রামে থাকুক না হলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাক। ভরতকে শক্তি ও সাহস জোগাতে মার্শম্যান নিজের উৎসাহে ছুটলেন যশোরে। প্রচণ্ড গরম তখন, মে মাসের দীপ্ত সূর্য মাথার উপরে। নৌকা করে গেলেন শুকসাগরে, ইচ্ছে ছিল বাকী পথ যাবেন পাল্কীতে—কিন্তু পাল্কী পাওয়া গেলনা—কর্তব্যের আহ্বানে পথে বেরিয়ে ঘরে ফিরে যাবেন এ হেন দুর্বল লোক

ছিলেন না মার্সম্যান। দারুণ সূর্যতাপ মাথায় নিয়ে সারা দিন পথ হেঁটে রাত্রি যাপন করলেন এক গ্রামের কালীমন্দিরে। পরদিন সকালে ভরতের গ্রামে পৌঁছলেন। ভরতকে উৎসাহ দিলেন, বোধ হয় বল্লেন ঈশ্বরের পুত্র মানুষের সকল দুঃখকে নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন —দুঃখ সহ্য করার মধ্যেই তো খৃষ্টের যথার্থ সাধনা। ভরত হয় তো বুঝেছিল কারণ শান্তচিত্তেই আবার সমস্তদিন পথ হেঁটে, কিছু পথ নৌকায় করে তিনি শ্রীরামপুরে ফিরে এলেন। সমসাময়িক কালের বিবরণীতে বলা হচ্ছে "Nothing but his iron frame could have stood such exertion."

যখনই তিনি ধর্মপ্রচারে বেরুতেন বাধাবিঘ্ন আর বিরূপতা ছিল তাঁর নিত্যসহায়। ১৮০৩ সালে যখন তিনি কয়েকজন দেশী খৃষ্টানকে নিয়ে ধর্মপ্রচারে বেরুলেন তখন যশোরে এক বিরাট জনতা ব্রাহ্মণদের উস্কানিতে প্ররোচিত হয়ে তাড়া করলো তাঁদের। মার্সম্যান তখন ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে কথা বলছেন। তিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর সহ-কর্মীদের বাঁচাবার চেষ্টা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সকলকে নিয়েই ম্যাজিস্ট্রেটের আশ্রয় পেলেন। এ সব বাধা তাঁর সয়ে গিয়েছিল। তাঁর চিঠিপত্রে এই সব ঘটনার উল্লেখ আছে ঠিক এমনভাবে যেন নিতান্তই একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে।

কিন্তু শুধু ধর্মপ্রচার করেই মার্সম্যানের কাজ ফুরিয়ে যায় নি। উইলিয়াম কেরী কোম্পানীর কলেজের কাছে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ করে ছাপা হোক। অর্থনৈতিক কোন ভরসা না পেয়ে কেরী উৎসাহ পাচ্ছিলেন না কাজ শুরু করতে। ১৮০৫ সালে ফ্রান্সিস বুকাননের সহায়তায় যখন ঐ পরিকল্পনা কাজে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা দেখা গেল তখন কেরী আর মার্সম্যান রামায়ণ,—Iliad of Sanscrit literature—অনুবাদের কাজ শুরু করলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় মার্সম্যান চীনাভাষা শিখতে শুরু করলেন। জোহানেস লাসের নামে এক কলকাতাবাসী আর্মেনিয়ান এই সময়ে শ্রীরামপুরে এলেন। তিনি চীনা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। মার্সম্যান তাঁর কাছেই শিখতে শুরু করলেন—সঙ্গে থাকতো সদাসর্বদা ডুহান্ডের চীনা অভিধান। দীর্ঘ পনেরো বছর প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব করে তিনি কাটিয়েছেন। যেটুকু ফাঁক পেয়েছেন সেটুকুই চীনাভাষার জন্য ব্যয় করেছেন। তিনিই প্রথম চীনাভাষায় বাইবেল অনুবাদ করলেন। পরবর্তীকালে চীনে যখন ধর্মপ্রচারে বাধা ছিল না তখন বহু মিশনারী সুদীর্ঘকাল সেখানে বাস করে আরও ভালো অনুবাদ করেছেন কিন্তু প্রথম অনুবাদ যে কি অসুবিধার মধ্যে মার্সম্যান করেছিলেন তা ভোলবার নয়। "While encumbered with numerous engagements of and anxities, devoted his time and energies to the prosecution of an object of which the only reward was the consciousness of having performed what was considered a duty."

এই সময় মার্সম্যানের কর্মক্ষমতা ও কর্তব্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা দেখা গেল লালবাজার চ্যাপেল সম্বন্ধে। খানিকটা তৈরি হয়ে অর্থের অভাবে যখন চ্যাপেল তৈরির কাজ বন্ধ রইলো তখন কলকাতায় ইউরোপীয়দের দরজায় দরজায় ঘুরে চাঁদা তুলতে দেখা গেল মার্সম্যানকে। ইউরোপীয়দের ব্যঙ্গবিদ্রূপ তিনি পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী।

মিশনারী কাজ করবার জন্য যেমন একদল লোক প্রাণ দিতে তৈরি হয়েছিলেন তেমনি মিশনের কাজে বাধা দেবার লোকেরও অভাব ছিল না। লর্ড মিণ্টো যখন গভর্ণর হয়ে এলেন তখন মিশন বিরোধী লোকেদের কাছে শুনে মিশন সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই তিনি এলেন। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত লেডেন

এবং ওয়ার্ড এই পরামর্শ দিলেন কেরী ও মার্শম্যানকে যে তাঁদের উচিত লর্ডমিণ্টোর সঙ্গে দেখা করে মিশনের সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকিবহাল করা। কেরী গেলেন, সঙ্গে গেলেন মার্শম্যান। লালবাজার চ্যাপেল ফাণ্ডে টাকা তোলার ব্যাপারে তাঁর বাকবিন্যাসের খ্যাতি রটেছিল। এখানেও মার্শম্যান অল্প সময়ের মধ্যেই মিণ্টোর মন জয় করলেন। রামায়ণের একটা অনুবাদ মিণ্টোকে উপহার দিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে লর্ড মিণ্টোর ধারণা ছিল—"that they were a body of wild fanatics, determined to push the conversion of the natives though it might set India in a flame and whom it was necessary therefore to place under the most vigoruous restrictions." যখন কথাবার্তা শেষ হলো লর্ড মিণ্টোর মনের গতি ঘুরেছে। এদের একটি লিখিত বিবরণ গ্রহণ করতে তিনি স্বীকৃত হলেন। মনে মনে এদের সখ্য কামনা ছাড়া আর কোন বোধ রইলো না।

অল্পদিন পরেই মার্শম্যান আর লাসারের অনূদিত চীনা বাইবেল প্রেসে গেল কিন্তু দেখা গেল অন্যান্য ভাষার মত সহজে চীনা অক্ষর তৈরি হয় না। সুতরাং ছাপা অনেক ব্যয়সাধ্য। মার্শম্যান বহু কষ্টে দুপাতা ছাপিয়ে আবার গেলেন লর্ড মিণ্টোর কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে। লর্ড মিণ্টো উৎসাহ দেখালেন কিন্তু প্রকাশ্যে মিশনারী কাজে সাহায্য করতে চাইলেন না। তখন এক কৌশল করলেন মার্শম্যান। তিনি আবার আবেদন করলেন কনফুসিয়াসের ইংরাজী অনুবাদ ছাপার জন্য। একরাত্রে এ কাজের পরিকল্পনা তৈরি করে ও পরের দিন তা ছাপিয়ে তিনি আবার লর্ড মিণ্টোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। লর্ড মিণ্টো তখন সানন্দে সই করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দু হাজার পাউণ্ড তুলে ফেললেন মার্শম্যান। তখন ঘোষণা করলেন যে ঐ অর্থে কনফুসিয়াসের অনুবাদ ছাপা হবে

এবং সেই অনুবাদ বিক্রীর পয়সা চীনা বাইবেল ছাপার ব্যাপারে ব্যয় করা হবে।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যানের কনফুসিয়াসের অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ফাদার রোড্রিগস্ নামে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারীও তাঁকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। লর্ড মিণ্টো মার্শম্যানের এই কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের কাছে বল্লেন: "What Mr. Marshman has already accomplished, both in tuition of the young but distinguished pupils, and in works, the produce of self-instruction, would have done honour to instructions fostered by all the aids of munificience and power."

মার্শম্যানের অধিকার ছিল ল্যাটিন, সংস্কৃত, চীনা ভাষায়। কেরীর সহযোগিতায় তাঁর রামায়ণ রচনা, কনফুসিয়াসের অনুবাদ এবং চীনা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ তাঁকে পণ্ডিতজনের সভায় তুলে ধরেছিল। দেশবিদেশে তাঁর চীনা অনুবাদের কথা ছড়িয়ে গিয়েছিল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ ডিভিনিটি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

অল্প কয়েকদিন পরে—১৮১৩ সালে তিনি একটি শিক্ষা পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করলেন। সেই খসড়া কেরী ও ওয়ার্ডের সমর্থন পাওয়ায় ফুলারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলো। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে বলা হচ্ছে "It is interesting as the first orgainsed plan for the establishment of school which had ever been devised in India." এবং মার্শম্যান সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে একমাত্র তিনিই এই শিক্ষার ব্যাপারে চিন্তা করতেন—"Only man who at the time took any interest in the question." তাঁর খসড়ায় দেখা যাচ্ছে যে শুধু ধর্মগ্রন্থ নয় অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতিও পাঠ্যতালিকার মধ্যে ছিল।

কিন্তু আরও কাজ অপেক্ষা করছিল মার্সম্যানের জন্য। বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে—অন্ধকার সংস্কারাচ্ছন্ন মনে জ্ঞানের আলো জ্বলবে এরই জন্যে তাঁর শিক্ষার খসড়া—এবং এরই জন্যে তাঁর 'দিগ্‌দর্শন' এবং 'সমাচার দর্পণ'। সরকার কি দৃষ্টিতে নেবে এই সমস্যা হলো প্রধান। সরকারের মনোভাব বোঝবার জন্যে একটা পত্রিকা সাময়িকভাবে প্রকাশের প্রস্তাব করলেন মার্সম্যান—"Feb. 13th 1818, Mr. Marshman having proposed the publication of a periodical work in Bengalee, to be sold among the natives for the purpose of exciting a spirit of enquiry among them, it was resolved that there is no objection to the publication of such a journal." প্রথম সংখ্যা দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত হলো। সরকারী বাধা এলো না কোনদিক থেকে। উৎসাহিত মার্সম্যান ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে শ্রীরামপুর প্রেস থেকেই 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করলেন। কেরী আশঙ্কিত হলেন, এর থেকে না আবার একটা গোলমাল দেখা দেয়। কিন্তু মার্সম্যানকে তখন থামানো তাঁর অসাধ্য। মার্সম্যান 'সমাচার দর্পণ' পাঠিয়ে দিলেন সরকারী দপ্তরে। না, এবারেও কোন প্রতিবাদ নেই। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রাহক সংখ্যা বাড়তে লাগলো—গ্রাহক তালিকায় উৎসাহী পাঠকদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম—দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিছুদিন পরেই অন্যান্য পত্রিকার স্রোত খুলে গেল। স্বয়ং রাজা রামমোহন পত্রিকা প্রকাশে অগ্রণী হলেন। পত্রিকার নদী বেয়েই বাংলাসাহিত্যের সমুদ্রে এসেছেন বাংলার সেরা লেখকেরা—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং আরো অনেকে। আজকের সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার প্রাচুর্যের দিনে আমরা মার্সম্যানের নাম ও কথা স্মরণ রাখলে অকৃতজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা পাবো—প্রথম পথিককে স্মরণ করে আনন্দ পাবো।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে তাঁর বড় মেয়ে সুসান উইলিয়ামস মারা যায়। বহু দুঃখকষ্টের সঙ্গে হাসিমুখে লড়াই করার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও একেবারে দুঃখে বেদনায় ভেঙ্গে পড়লেন মার্সম্যান। বোধহয় সেই দুঃখ থেকে মনকে মুক্ত রাখবার জন্যেই আবার পড়াশুনার মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন নিজেকে। পরের বছরে মারা গেলেন ওয়ার্ড। নিজেকে শান্ত করার পরীক্ষা আবার এলো নিজের কাছে। সুদীর্ঘকাল ওয়ার্ড ছিলেন সুখদুঃখের সঙ্গী—যত আনন্দ যত বেদনা সবই তো ভাগ করে নিয়েছেন সকলে। আজ যত জীবনের আলো স্তিমিত হয়ে আসছে—বন্ধুরা চলে যাচ্ছে ততই একে একে—দুঃখ করে লিখছেন "I never did anything, I never published a page, without consulting him."

১৮২৬ সালে মার্সম্যান ইংলণ্ডে যান—ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট সোসাইটির সঙ্গে যে মনোমালিন্য দেখা দিচ্ছিল তারই একটা বন্দোবস্ত করতে। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কি আশ্চর্য অনুভূতিতে মন ভরে গেল। সেই পরিচিত শৈশবের পরিবেশ, বন্ধুদের মুখে সেই জোশুয়া ডাক—কোন স্বপ্নের জগতে নিয়ে গেল। তিন দিন আত্মীয় স্বজন বন্ধু প্রতিবেশীদের মধ্যে কাটিয়ে তিনি গেলেন ব্রিস্টলে। এবারে দেখা হল রবার্ট হলের সঙ্গে, তখনকার ইংলণ্ডের রসিক বিদগ্ধ সমাজের নেতা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা তিনি। সেখান থেকে মার্সম্যান গেলেন ডেনমার্ক—রাজার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে। সুদীর্ঘকাল ডেনমার্কের রাজা শ্রীরামপুর মিশনারীদের রক্ষা করেছেন, কলেজের জন্য জমি ও বাড়ি দান করেছেন। সেখান থেকে হামবুর্গ, হল্যাণ্ড, প্যারী। সেখানে প্রফেসর রেমুসার সঙ্গে দেখা হলো—তাঁকে জানালেন শ্রীরামপুর মিশনের কার্যকলাপ। তারপর ফিরে এলেন ইংলণ্ডে। দেখা হলো ওয়াল্টার স্কটের সঙ্গে। সান্ধ্যআসরে দুজনে বসে স্মরণ করলেন বন্ধু লেডেনকে। কিন্তু যে কাজের জন্যে যাওয়া তার কিছুই

হলো না—ইংলণ্ডের সোসাইটির সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ইংলণ্ডে নিন্দার ঝড় উঠলো—শ্রীরামপুর মিশনের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় প্রবন্ধে বিষোদগার শুরু হলো। মার্সম্যান একা তার বিরুদ্ধে লড়তে লাগলেন। সঙ্গে যোগ দিলেন বন্ধু ফস্টার। কিন্তু বিরুদ্ধতার ঢেউ ক্রমশ প্রবল হতে লাগলো। নানাদিক থেকে এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা হলো যে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা সোসাইটির সম্পত্তি অপহরণের চেষ্টা করেছে। মার্সম্যান তখন সারা ইংলণ্ড ছুটে বেড়াতে লাগলেন—অর্থ সঞ্চয় করতে লাগলেন—, 'Not, as before for the Society, but for Serampore.' এই অর্থহীন লড়াই বেশীদিন চালাবার মত মনের অবস্থা কারুরই থাকা সম্ভব নয়।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২৯ সালে তিনি আবার ভারতবর্ষে ফিরে চললেন। যে ইংলণ্ড তাঁর স্বদেশ সেখানকার ঈর্ষাতপ্ত, কোলাহলের মধ্যে আহ্বান এলো গঙ্গাতীরের শান্ত সাধনাশ্রমের। মার্সম্যান ফিরে এলেন। এবারে সেই অপরিচিত 'হিদেন'দের ভারতবর্ষে নয়, পরিচিত দেশ ও মানুষের মধ্যে তাঁর নিজের গড়ে তোলা তিরিশ বছরের কর্মক্ষেত্রে। ১৯শে মে তিনি শ্রীরামপুরে এসে নামলেন। এই অর্থহীন দ্বন্দ্বে তাঁর চেহারায় স্পষ্ট বার্ধক্যের ছাপ লক্ষ্য করলেন বন্ধুরা—"fifty years older." কিন্তু ইংলণ্ডের দলাদলির ভূত অনেকদিন তাঁদের পিছনে লেগেছিল। মার্সম্যান তাঁর স্কুল থেকে হাজার পাউণ্ড আয় করতেন। তার থেকে একশো পাউণ্ড সংসারের জন্য রেখে বাকী সব টাকাই মিশনে দিতেন। তবু ঐ সমালোচনার ঝড়ে শেষ পর্যন্ত কলেজ কম্পাউণ্ডের বাসা তাঁকে ছেড়ে যেতে হলো। তাঁর সুদীর্ঘকালের পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগের প্রতি এই অবিশ্বাস তাঁকে দুর্বল করে দিল, হতাশ করে দিল। কেরী একটি চিঠিতে লিখেছেন বছর পাঁচেক পরে—"Dr. Marshman who had been so long

under the excitement of those disagreeable circumstances, is now sinking under a morbid depression." মার্সম্যানের স্বাস্থ্য ভাল হবার কোন আশাই আর রইলো না কেরীর মৃত্যুর পর। যে মিলিত নেতৃত্ব শ্রীরামপুর মিশনারীদের বাংলার ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট মর্যাদার আসন দিয়েছে তার শেষ ভগ্নাবশেষ পড়ে রইলো জীর্ণ বেদনাগ্রস্ত মার্সম্যানের মধ্যে। আবার সমালোচনার ঝড় উঠলো। কেরী তো নেই—মিশন রেখে লাভ কি, তুলে দাও মিশন ইত্যাদি কথা শোনা গেল।

এই সময়ে শ্রীরামপুর মিশনারীদের পক্ষ থেকে ম্যাক আর লীচম্যান যে চুক্তি করলেন ব্যাপটিস্ট সোসাইটির সঙ্গে তা হলো এই যে শ্রীরামপুর মিশন আবার সোসাইটির সঙ্গে মিলে যাবে। বইপত্র যা আছে তা সাধারণের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে, এবং তা সবই কমিটির হাতে আসবে তবে যতদিন মার্সম্যান আছেন ততদিন কিছুই করা হবে না—"but it is agreed that no changes shall be made in the administration affairs at Serampore till the decease or voluntary resignation of Dr. Marshman." ম্যাক আর লীচম্যানের সঙ্গে যখন এই সব আলাপ আলোচনা চলছে তখন মার্সম্যান এগিয়ে চলেছেন ধীরে ধীরে তাঁর শেষ পরিণতির দিকে। ১৮৩৭ সালের গ্রীষ্মকালে উত্তাপ বাড়লো অন্য বছরের চেয়ে। ভাঙ্গা শরীরে সে উত্তাপ সহ্য করা কষ্টকর হলো। দুরারোগ্য ব্যাধি জীর্ণ শরীরকে আক্রমণ করেছে। মৃত্যুর কদিন আগেও তিনি বাংলায় প্রার্থনা করেছেন, বাংলায় অধ্যাত্মবিষয়ের আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রথম যৌবনের আনন্দ স্মরণ করে আত্মকাহিনী বলতে লাগলেন। পাশে বসে ছোট মেয়ে লিখে নিতে লাগলো। তারপর একদিন সকালে সকলকে কাছে ডাকলেন, বল্লেন—মৃত্যু আসন্ন। প্রার্থনা করলেন সকলের সঙ্গে—"and then turning on

his side composed himself as in sleep. From that posture he never moved."

এমনি করে শ্রীরামপুর মিশনের শেষ প্রদীপ নিভলো।—প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চার পুরোধা হিসাবে জোন্স, বাংলা ছাপা অক্ষরের প্রথম শিল্পী হিসাবে উইলকিন্স, বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কেরী, অশোকলিপির অর্থসন্ধানী হিসাবে প্রিনসেপ যে সম্মান পেয়েছেন বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মার্সম্যানকে সে সম্মান আমরা দিইনি। ভারতবর্ষের সেবায় উৎসর্গীত প্রাণ, বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম স্রষ্টা মার্সম্যানকে আজ তাই দূর থেকে হলেও আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি।

মণিয়ার উইলিয়মস

ভারতবর্ষের প্রতি গভীর ভালবাসা নিয়ে যে কজন ইংরেজ এদেশে এসে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে জানবার চেষ্টা করেছেন তাঁদেরই একজন স্যার মণিয়ার উইলিয়ামস। কঠোর পরিশ্রমে তিনি সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে য়ুরোপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটানোর। ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি অক্সফোর্ডে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সরকারী পদমর্যাদার অধিকার তাঁর ছিল না। শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি ভারতবর্ষ ও তাঁর সাহিত্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে ঋণী থাকবে চিরদিন।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর আকর্ষণের একটি প্রধান কারণ বোধহয় এই যে ভারতবর্ষ তাঁর জন্মভূমি। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁর পিতা এদেশে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সার্ভেয়র জেনারেল ছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর মণিয়ার উইলিয়ম্‌সের জন্ম। কিন্তু শৈশবের দিন তাঁর ভারতবর্ষে কাটেনি। পিতার সঙ্গে ইংলণ্ডে যখন ফিরে যান তখন তাঁর মাত্র দুবছর বয়স। এক বছর পরেই ভগ্নস্বাস্থ্য পিতার মৃত্যু হয়। মিসেস উইলিয়মসের তত্ত্বাবধানেই মণিয়ার মানুষ হতে লাগলেন। কমনীয় প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী এই নারীর প্রভাব মণিয়ার বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন পরবর্তী জীবনে। শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ যেমন তাঁর মার কাছ থেকে পাওয়া তেমনি পাওয়া গভীর ধর্মবিশ্বাস।

একাধিকবার গুরুতর রোগে আক্রান্ত হবে বালক মণিয়ার রুগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। স্বাস্থ্যের দুর্বলতা ভিতরকার দৃঢ়চিত্ত কর্মঠ মানুষটিকে কিন্তু কখনো পরাভূত করতে পারেনি।

অল্প বয়সেই তিনি স্কুলের পড়া শেষ করলেন। এত অল্প বয়সে কিংস কলেজে পড়া তাঁর সম্ভব হলো না। কিছুদিন বাড়িতে পড়ে তিনি ভর্তি হলেন বেলিয়ল কলেজে। সেখানে বিদ্যাচর্চার পরিবর্তে দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও শরীর চর্চা চলতে লাগলো। নৌকা চালিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে উচ্ছ্বসিত যৌবনের দিনগুলি কাটতে লাগলো।

এদিকে ভারতবর্ষে সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছিল ভাই অ্যালফ্রেড। তার কাছ থেকে আহ্বান এলো ভারতবর্ষে আসবার জন্য। তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষের ডাক যে তাঁর মনের মধ্যে কখনো সাড়া তোলে নি তা নয়। ভাইয়ের চিঠি পেয়ে মার মতামত জানতে চাইলেন। মিসেস উইলিয়ম্‌স্‌ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মারফৎ মণিয়ারের জন্য কাজও ঠিক করলেন। ১৮৪০ সনে ভারতযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মণিয়ার হেলিবেরী কলেজে ভর্তি হলেন। যে সব ছাত্রেরা ভারতবর্ষে চাকরী করতে যাবে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল হেলিবেরীতে। কলেজের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় মণিয়ার অবলীলাক্রমে প্রথম হতে লাগলেন। যখন তৃতীয় পরীক্ষা শেষ হবার মুখে তখন ভারতবর্ষ থেকে খবর এলো বেলুচিস্থানে একটি দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে অ্যালফ্রেডের মৃত্যু হয়েছে। গভীর স্নেহ ছিল ছোট ভাইটির প্রতি—তার মৃত্যুতে এক দুঃসহ বেদনার ছায়া পড়লো সারা পরিবারের উপর। শোকসন্তপ্তা মাকে ফেলে ভারতে যাবার ইচ্ছা তখনকার মত রইলো না—তিনি আবার অক্সফোর্ডে ভর্তি হলেন।

এবার আর তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে মনিয়ার লাগলেন পড়াশুনোর কাজে। কঠোর পরিশ্রম শুরু করলেন তিনি। তার ফলও পেলেন হাতে হাতে। দুর্বল শরীর বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তিনি গেলেন আইল অব ওয়াইটে। সেখানে রুগ্ন শরীর খানিকটা সুস্থ হোলো বটে কিন্তু মনের অস্বস্তি দিন দিনই

বাড়তে লাগলো। ভবিষ্যতের ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরা তো ছেড়েছেন, কিন্তু আর তো কোনও পেশা স্থির হোলো না এখনও। সামান্য একটি চাকরী নিয়ে শুধু দিন কাটিয়ে দেওয়াও উচ্চাভিলাষী মণিয়ারের মনঃপূত নয়। ভেবেচিন্তে তিনি স্থির করলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলেজে পড়ার সময় সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যে সামান্য পরিচয়টুকু হয়েছিল তাকেই আরও গভীর করে তুলবেন। অক্সফোর্ডে প্রফেসর হোরেস হেম্যান উইলসনের কাছে পড়বার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃত বোডেন স্কলারশিপের জন্য তিনি প্রার্থী হলেন। স্কলারশিপটা পাওয়াতে মনিয়ারের পাঠানুরাগ আরও প্রবল হয়ে উঠলো। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্য এবারও তাঁর প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। ফলে অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার আর তাঁর সুযোগ হোলো না, সাধারণ পাসেই পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু পাসএর পরীক্ষায় তাঁর ফল এত ভাল হোলো যে সেই পরীক্ষার ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনার্স ডিগ্রীর সম্মান দিলেন।

এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মণিয়ারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির হয়ে গেল। জনৈক ভারত প্রত্যাগত সিভিলিয়ান একদিন এসে খবর দিলেন হেলিবেরী কলেজে প্রাচ্যভাষার অধ্যাপকের একটি নতুন পদের সৃষ্টি হচ্ছে। সে পদের প্রার্থী হলেন মণিয়ার উইলিয়মস। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হেলিবেরী কলেজে সংস্কৃত, পারসিক ও হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

অধ্যাপনাকে মণিয়ার-উইলিয়ম্স্ শুধু একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। প্রাচ্যভাষায় তাঁর খ্যাতি তখনই বহুদূরে ছড়িয়ে গেছে। তাঁর মনে হলো যে এই খ্যাতির যোগ্য কোন কাজ তাঁর করা দরকার। ছোটখাটো সাধারণ কাজে হাত দিয়ে শক্তি অপব্যয়

না করে তিনি একেবারেই ইংরাজী সংস্কৃত অভিধান রচনায় হাত দিলেন। তখনকার দিন অধ্যাপনার কাজ খুব সুখকর ছিল না। ছাত্রউচ্ছৃঙ্খলতার সমস্যা ছিল আজকের মতোই। হেলিবেরী কলেজের ছাত্রদের অবস্থা তখন উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে। পোষাক পরিচ্ছদের কোন রীতি কেউ মানতো না, ক্লাসে আসা যাওয়াটাও ছিল ছাত্রদের একান্ত ইচ্ছাধীন। অধ্যাপকের বক্তৃতা তারা মন দিয়ে শুনবে এ ছিল নিতান্ত দুরাশা। মণিয়ার উইলিয়মস তখন পঁচিশ বছরের যুবকমাত্র—ছাত্ররা অনেকেই তাঁর চেয়ে বড় বা তাঁর সমবয়সী। নিজের ক্লাসে দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়মশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন তিনি—ছাত্রদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও। এই অধ্যাপনার কঠিন কাজের মধ্যেই তিনি অভিধান রচনায় হাত দিয়েছিলেন। অবসর সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি অভিধানের কাজে ব্যয় করতে লাগলেন। যে বয়সে ইংলণ্ডের যুবক অজস্র আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ উল্লাসে দিন কাটায় সেই বয়সে এক দূর দেশের ভাষার অর্থ সন্ধানে নিজেকে উৎসর্গ করলেন মণিয়ার উইলিয়ামস।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। অভিধানের প্রথম খণ্ড সেই বছরেই প্রকাশিত হলো। পরের বছরে বেরুলো দ্বিতীয় খণ্ড। কিন্তু শুধু অভিধানে তো বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। চাই ব্যাকরণ—ইতিপূর্বে উইলকিন্স, কোলব্রুক, উইলসন প্রভৃতির সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল—তার কোনটা অসম্পূর্ণ কোনটা দুষ্প্রাপ্য। নতুন পাঠকদের পক্ষে উইলসন দুর্বোধ্য। অভিধান প্রকাশের কয়েক বছর আগেই ব্যাকরণ প্রকাশিত হলো। এই সহজবোধ্য ব্যাকরণ ছাত্রসমাজে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করলো। রেভারেণ্ড লং বল্লেন "It had brought down Sanskrit from the clouds to dwell among men." শুধু ব্যাকরণ আর অভিধানই নয়—১৮৫৩ প্রকাশিত হলো 'শকুন্তলার' ইংরেজী সংস্করণ।

কিন্তু জীবনের সমস্তটাই ব্যাকরণ আর অভিধান নয়। শকুন্তলাও শুধু স্বপ্ন নয়। হেলিবেরীর কাছে এক গ্রামে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখা হয়ে গেলো শ্রীমতী জুলিয়া ফেথফুলের সঙ্গে। প্রথম পরিচয়ের সলজ্জ আলাপ অচিরকালে ঘনিষ্ঠ প্রণয়ে পরিণত হলো। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর এর পর তিনি বেঁচেছিলেন। যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তির দাম্পত্য জীবন তিনি লাভ করেছিলেন তার শুরু হলো এইখানেই। সে দাম্পত্যজীবন নিছক স্বপ্নবিলাসের ললিত রাগিনীর সুরে বাঁধা রইলো না। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কাজও বেছে নিলেন। প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের ছেলেদের নিয়ে অধ্যাপক খুললেন সানডে স্কুল, অধ্যাপক পত্নী ভার নিলেন মেয়েদের। অল্পবিত্ত লোকেদের জন্যেও একটি ক্লাস খোলা হলো। পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য তাঁর স্বাভাবিক হৃদয় উত্তাপটুকুকে শীতল করে দিতে পারে নি। অসহায়, দুর্বল মানুষদের জন্য তাঁর সহানুভূতির শেষ ছিল না। একদিকে চললো পূর্ণ উদ্যমে প্রাচ্যভাষা চর্চা আর একদিকে ছাত্রদের নিয়ে পাঠ্যবস্তুর আলাপ আলোচনা। ছাত্রবন্ধু বিশেষণে সহজেই তাঁকে ভূষিত করা যেতে পারে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হেলিবেরী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক জনসনের মৃত্যু হলো। প্রফেসর হলেন মণিয়ার উইলিয়মস।

কিন্তু কতদিনের জন্যই বা সে পদ পাওয়া! ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই ১৮৫৭ সালে ভারতের শাসনভার ইংরাজ রাজার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলো। ১৮৫৮ সালে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে হেলিবেরী কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হলো। তাঁর শেষ দিনের বক্তৃতায় মণিয়র এই বলে ঈশ্বরের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন যে শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাড়ে তের বছরের কর্মজীবনে একটি দিনের জন্যও অনুপস্থিত থাকেন নি।

এর পর গেলেন চেল্টেনহাম কলেজে। হেলিবেরী তাঁর মনের আকাশ আচ্ছন্ন করে আছে—নতুন করে চেল্টেনহামের সঙ্গে আর মনের যোগ হলো না। এখানে পড়াতে হয় উর্দু। উর্দু জানলেও সংস্কৃতের মত আন্তরিক টান ছিলনা উর্দুর প্রতি, তবু কর্তব্যপালনের খাতিরে ছাত্রদের জন্য এই সময় তিনি একটি হিন্দুস্তানী পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেন। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য সেইটিই একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ালো।

১৮৬০ সাল—মণিয়ার উইলিয়মসের জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হলো। এই বছরে অক্সফোর্ডে বোডেন অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসনের মৃত্যু হয়। এই পদের সৃষ্টি করেছিলেন বোম্বাই সেনাদলের নায়ক কর্ণেল বোডেন। বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ ছিল তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। ১৮৩২ থেকে ১৮৬০—এই সুদীর্ঘকাল উইলসন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এই পদে কাকে নেওয়া হবে সে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যাঁরা অক্সফোর্ডের এম. এ. তাঁদের ভোটের দ্বারাই প্রার্থী নির্বাচিত হবেন। মণিয়ার উইলিয়মসের একটি মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—কিন্তু অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রফেসার ম্যাক্সমূলার। সাতমাস ধরে ভোট নেওয়া হলো। সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যে যেখানে যত অক্সফোর্ডের এম. এ. আছেন পত্রযোগে তাঁদের ভোট এলো। সাতমাসের ভোটাভুটির পর প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে মণিয়ার উইলিয়ামস নির্বাচিত হলেন। জীবনব্যাপী সাধনার আর কি পুরস্কার তিনি আশা করতে পারতেন।

হেলিবেরী, চেল্টেনহামের নির্জন পরিবেশ থেকে তিনি এসে পড়লেন সহরের জ্ঞানী গুণী বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে। পূর্ণ উদ্যমে তিনি কাজে লাগলেন; এবারকার কাজ সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান। ফাঁকি দিয়ে কাজ সারবার লোক তিনি ছিলেন না। প্রথমেই ধরে

নিলেন অন্ততঃ দশ বারো বছর অন্য সব চিন্তা দূরে সরিয়ে একাগ্রমনে অভিধান রচনার কাজ চালাতে হবে। জার্মান পণ্ডিতদের রচনার সঙ্গে পরিচয় থাকলে কাজের সুবিধা হবে মনে করে তিনি জার্মান ভাষাও শিখতে লাগলেন। সাহায্য পেলেন ডাক্তার ওয়েঙ্গারের—ভারত প্রত্যাগত এই মিশনারী বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৭২ সালে প্রথম সংস্করণ অভিধান বেরোয়। তার সংস্কার ও সংশোধনের কাজ চলেছিল সারা জীবন ধরেই।

অভিধান রচনার পর কিছুদিন বিশ্রামের জন্যে গেলেন আইল অফ ওয়াইটে ভেণ্টনর নামে এক নির্জন শহরে। সেখানে একটি ছোট্ট বাড়ি তিনি কিনেছিলেন। এই বিশ্রামের সময়ই হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হলো ভারতবর্ষে পাড়ি দেবার কথা। দীর্ঘদিনের অভিধান রচনার নিদারুণ পরিশ্রম থেকে সাময়িকভাবে ছুটি মিলেছে। তাছাড়া মনে হলো ভারতবর্ষকে সঠিকভাবে জানতে হলে বইপড়া বিদ্যেই সব নয়—একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগও চাই। এই সময় অক্সফোর্ডে তাঁর বক্তৃতাগুলির একটি সংকলন তিনি প্রকাশ করলেন। তার নাম Indian Wisdom. এই বক্তৃতাগুলি তৈরি করার সময় ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের অপূর্ণতা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। বহু প্রশ্নের উত্তর তাঁর নিজের কাছেই অজানা ছিল। তাই বার বার মনে হয়েছে এই সুদীর্ঘকালের সভ্যতা, এই চল্লিশকোটি লোকের সংস্কৃতি, এই বিরাট মহীয়সী সংস্কৃত ভাষাকে দূর থেকে জানবার চেষ্টা দুঃসাহসের নামান্তর। তাছাড়া আরও একটি সত্য হঠাৎ তাঁর কাছে আবিষ্কৃত হলো—সেটি হলো এই যে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা তাঁর হয়েছে।

Indian Wisdom প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। বইটি শেষবারের মত ভাল করে লেখবার ফাঁকে ফাঁকে ভারতযাত্রার প্রস্তুতি চলতে লাগলো। অক্সফোর্ডে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট গড়ে

তোলায় ভারতীয়দের সাহায্য লাভ করাও তাঁর ভারতযাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত মর্মে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মণিয়ার উইলিয়মস এই সঙ্গে একটি বিবৃতিতে বললেন—"The principal object of such an Institution would be to form a centre of union, intercourse, inquiry and instruction for all engaged in Indian studies. It might also contain a Library and Museum, and might combine appliances for the promotion of Semitic studies, so as to become a nucleus of development for a complete Oriental School at Oxford." মৌলিক চিন্তাশক্তি ও সুদূরপ্রসারী কল্পনার পরিচয় আছে এই সব কথায়। এই কাজে ভারতীয়দের সহায়তা পাবার বাসনাও তাঁর ভারতযাত্রার অন্যতম কারণ।

১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাস - স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে এসে নামলেন বোম্বাইতে—যেখানে জন্ম হয়েছিল তাঁর। তাঁর নিকট আত্মীয় মিঃ শেপার্ড ছিলেন খয়রা জেলার কলেক্টর। মিঃ শেপার্ড ছিলেন আমেদাবাদে—সেখানেই সপরিবারে মনিয়ার উইলিমস আতিথ্য গ্রহণ করলেন। শেপার্ড প্রায়ই যেতেন সফরে—সঙ্গে মণিয়ার যেতে লাগলেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন তাঁরা সফরের সময়। ভারতবর্ষের মানুষকে দিনে রাতে খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। গ্রামের জীবনযাত্রার কিছু কিছু ছবি তাঁর অনুসন্ধানী চোখে ধরা পড়লো। উত্তরভারতের বড় বড় সহরে তিনি গেলেন এর পর। বোম্বাই থেকে পুণা, এলাহাবাদ হয়ে কলকাতা। কলকাতা থেকে কাশী লক্ষ্ণৌ আগ্রা লাহোর। সবশেষে আবার বোম্বাই। টাইমটেবিল পড়া টুরিস্টের ভারত

পর্যটন নয়—এ হলো সংস্কৃত সাহিত্য সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ভারত সাধকের ভারত সন্ধান। তিনটি উদ্দেশ্য তাঁর মনের কাছে আরও স্পষ্ট হলো—প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে আরও পূর্ণভাবে জানা, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় ধর্ম সাহিত্য রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয় পূর্ণতর করা। তৃতীয়তঃ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটুটের কাজে ভারতীয়দের সহায়তা লাভ করা।

বোম্বাইয়ে চারজন পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হলো। স্বচ্ছ, স্পষ্ট, সংস্কৃতে আলাপ আলোচনা হলো। তারপর আমেদাবাদে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি গোড়াতেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিতেন তাঁর জ্ঞান অল্প, তিনি এসেছেন দূর সমুদ্রপারের দেশ থেকে—তিনি শিক্ষার্থী। ভারতীয় পণ্ডিতেরা পুলকিত হলেন আনন্দিত হলেন, দেখলেন এই নবাগত শিক্ষার্থী অনর্গল সংস্কৃত বলে, শাস্ত্র পুরাণ একেবারে তার কাছে অজানা নয়। তাঁরাও গভীর আগ্রহে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

ভারতবর্ষকে জানতে এসে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হলো তাঁর। কতদিনের কত ঘটনা, কত দৃশ্য সারাজীবন তাঁর মনে গেঁথে রইলো। কোন এক শীতের প্রভাতে, হুগলিজেলার ছোট্ট একটি গণ্ডগ্রামে দুজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন টোলের কয়েকটি ছাত্রের কাছে। চারদিকের ঘনগাছপালাঘেরা ছোট্ট খড়ে ছাওয়া মেটে ঘরের দাওয়ায় বসে দুজন দরিদ্র পণ্ডিত রঙীন চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে ছাত্র পড়াচ্ছেন—তাদের পাণ্ডিত্যের তল পেলেন না মনিয়র—এ দৃশ্য তিনি ভুলতে পারলেন না। এর বিপরীত অভিজ্ঞতা হলো বারাণসীর রাজদরবারে। প্রচণ্ড আড়ম্বরে সুসজ্জিত সভাগৃহে এলেন রাজপণ্ডিতরা। একটি প্রশ্নেই বারুদের স্তূপে যেন আগুন ধরে গেল। সমস্বরে কোলাহল করে পণ্ডিতরা

উত্তর দিতে লাগলেন—কণ্ঠস্বর উচ্চ হতে উচ্চতর হতে লাগলো। বিকৃত অহংকার দম্ভ বিকীর্ণ করে আত্মঘোষণা করতে লাগলো। বিস্ময়ে নির্বাক মনিয়ার এই আচরণের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলেন না। পুণ্যতীর্থ বারাণসী যে হিন্দু সাধনার কেন্দ্র, সেখানেই এই অবস্থা। মনে পড়লো হুগলি জেলার সেই শান্ত অপ্রচারিত পণ্ডিতদের। আরও দেখলেন যে শেষ পর্যন্ত ঐ কোলাহলের সমাপ্তি ঘটালেন স্বয়ং বারাণসীর মহারাজ—যিনি নিজে তাঁর পণ্ডিতদের চেয়ে কম ছিলেন না একটুও।

গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পোষাকের মহার্ঘ্যতা তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করলো। কিন্তু তার চেয়ে অভিভূত হলেন বিশেষ একটি তিথিতে অগণিত তীর্থযাত্রীর ভক্তিবিমোহিত মুখের চেহারা দেখে। অযোধ্যায় রামায়ণের স্মৃতিবিজড়িত পুরানো বাড়িগুলি, তারই পাশে মুসলমান স্থাপত্যের নানা নিদর্শন সেও এক বিচিত্র দৃশ্য। নানা জায়গায় পূজা দেখলেন, ধর্ম আলোচনায় উপস্থিত থেকে হিন্দু ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন। হিন্দুধর্মের ও বিশ্বাসের যে তত্ত্বগুলি তাঁর কাছে এতদিন অজানা ছিল তার উপর থেকে একটি একটি করে পর্দা সরে যেতে লাগলো। যেমন একটি আলোচনা সভায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গ, পরমাত্মার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের একাত্মতা, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ, কর্মফল, মায়াবাদ প্রভৃতি আলোচনা শুনে ও সবশেষে ভক্তকণ্ঠের কীর্তন শুনে তিনি যে জিনিসের পরিচয় পেলেন তা হাজার বই পড়েও একজন প্রাচ্য-বিজ্ঞানী জানতে পারে না।

হিন্দুধর্মের এই পরিচয় তাঁর নিজের অনুভূতিগুলিকে আরও গভীর করলো। নতুন করে তিনি খৃষ্টীয় সহনশীলতার মর্ম উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি দেখলেন যে হিন্দুধর্মেও এমন জিনিস আছে যা খৃষ্টানের পক্ষেও অনুকরণীয়।

"There is in Hinduism a beautiful tenderness towards lower animals so mysteriously related to us and so pathetically dependent on us a tenderness which well deserves the invitation of christian nations."

অন্যত্র তাঁর ডায়েরীতে লিখছেন "There is the doctrine that every man has the eternal and infinite deity dwelling within him·········the fact that true Brahminism has spiritual ideas should make us hesitate before we bracket all the Non-christian religions of the world together or brand them all indiscriminately with the approbrious term—"Heathen."

কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের কথা এর মধ্যেও তাঁর মনে ছিল। তিনি আসবার আগের দিন ভারতে এসেছেন ইংলণ্ডের যুবরাজ। তাঁর শুভেচ্ছা তিনি কাজে লাগালেন। ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক ইনষ্টিটিউটের একজন পৃষ্ঠপোষক হলেন। বড় বড় রাজামহারাজাদের সমর্থন আদায় করলেন। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের নানা সভায় বক্তৃতা দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য প্রচার করলেন। যখন ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছেন তখন তাঁর পরিকল্পনা অনেকখানি এগিয়েছে।

ভারতবর্ষের কর্মব্যস্ত দিনগুলি কাটিয়ে ১৮৭৬ সালে তিনি যখন ফিরলেন তখন প্রাচ্যবিদ্যা অধ্যাপনার যোগ্যতা যে তাঁর বেড়েছে এ তিনি নিজেই উপলব্ধি করলেন। কিন্তু ভারতের একটা বিরাট অংশ তখনো বাকী রয়ে গেল—বাকী রইলো দক্ষিণ-ভারত এ কথা তিনি ভুলতে পারলেন না। ঐ বছরেই শেষের দিকে তিনি আবার ভারতে এলেন।

এবার দক্ষিণ ভারত। এবারও তিনি ঘুরে বেড়ালেন মন্দিরে মন্দিরে, তীর্থস্থানে, ধর্মসভায়, আলোচনাক্ষেত্রে। সুদূর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সারা ভারতের সব বড় বড় হিন্দুসংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রগুলিতেই তিনি গিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু-

মন্দির, দক্ষিণ ভারতীয়দের গভীর ধর্মবিশ্বাস তাঁর উপলব্ধিকে গভীরতর করলো। হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পার্থক্য উত্তর ভারত ভ্রমণকালে ধরা পড়েনি—এবার ধরা পড়লো। তিনি বলছেন "এখানে ধর্ম দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে জড়িত আরও দর্শনীয় তার প্রকাশ। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর প্রকৃতি এমন নয় যা চরিত্রে দৃঢ়তা আনে ও লোভের নিবৃত্তি ঘটায়।" লোকাচার ও কুসংস্কার জাতীয় জীবনে কি নিদারুণ ক্ষতির কারণ হতে পারে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "আমার মতে হিন্দুধর্মাবলম্বী অধিকাংশ লোকের বর্তমান নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির হীন অবস্থার কারণ তাদের সামাজিক প্রথাগুলি—যা থেকে তাদের সব অন্ধ-বিশ্বাসের উৎপত্তি। It is very true that these social usages, enforced by caste rules, are now part and parcel of their religious creeds, but they do not properly belong to the original pure from of Hindu religion. এরা সম্পূর্ণরূপে ধর্মের বিকৃতিরই প্রকাশ।" তিনি বুঝেছিলেন যে বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা এই সব গোঁড়ামীর মূলে আছে বর্ণবৈষম্য।

১৮৮৩-৮৪ সালে তিনি তৃতীয়বার ভারতে আসেন। এবার তিনি মার্কুইস অফ্ রিপণের অতিথি। তাঁর এবারকার আগমনের প্রত্যক্ষ ফল হলো অক্সফোর্ডে পঠনেচ্ছু ভারতীয় ছাত্রদের বার্ষিক দুশো পাউণ্ডের চারটি বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট গঠনের কাজ অনেক এগিয়েছে। দেশে ফিরে তিনি সেই উদ্দেশ্যে বিশ হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন হলো। এই প্রতিষ্ঠান গঠনে মণিয়ার উইলিয়মসের অবদান স্মরণ করে ১৮৮৬ সালে তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়। পরের বছর তিনি Knight Companion of the order of the Indian Empire উপাধি পেলেন।

তারপর এলো অবসর যাপনের দিন। কখনো ভেন্টনরে কখনো দক্ষিণ ফ্রান্সে তাঁর দিন কাটতে লাগলো। কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর বইগুলির সংশোধন ও নূতন সংস্করণ বার করা। ১৮৯৮ সালের তেরই জুলাই স্যার মণিয়ার ও লেডী মণিয়ার উইলিয়মস তাঁদের বিবাহিত জীবনের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করলেন। ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীদের নিয়ে আনন্দের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর সুখ-সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে তিনি বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

কিন্তু প্রদীপের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে। ১৮৯৯ সালের শীত কাটতে তিনি আবার গিয়েছেন দক্ষিণ ফ্রান্সে। সেখানে ৯ই এপ্রিল রাত্রে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দশই এপ্রিল সকালে প্রবল শ্বাসকষ্টের মধ্যে উপস্থিত সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি শেষ প্রার্থনা মুখে মুখে বল্লেন। সেটি লিখে নেওয়া হয় তিনি নিজে সংশোধন করে দেন সে লেখা। ১১ই এপ্রিল ভোরে তাঁর জীবন-প্রদীপের শেষ আলোটুকু সূর্যোদয়ের আলোয় মিলিয়ে গেল।

শান্ত সংযত অথচ দৃঢ়সঙ্কল্প চরিত্রের লোক ছিলেন মণিয়ার উইলিয়মস। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, রাজকীয় সম্মান কোন কিছুই তাঁর বিনয় ও নম্র ব্যবহারকে স্পর্শ করতে পারে নি। ভারত ও ইংলণ্ডের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করা তাঁর সারা জীবনের সাধনা ছিল। প্রধান ভারতীয় ধর্মগুলি—হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম—সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল যথার্থ গভীর। যে কাজ তিনি বেছে নিয়েছিলেন তা ছিল যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য। তিনি যে শুধু কর্তব্যপালনের জন্য তা করেন নি, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর যে যথার্থ ভালবাসা ছিল তার প্রমাণ তাঁর অভিধান, তাঁর ভারত পর্যটন, তাঁর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট। তাঁকে আমরা বলতে পারি ভারতবন্ধু মণিয়ার উইলিয়মস। তিনিও বোধহয় এই পরিচয়ে খ্যাত হলে খুসী হতেন।

পরিশিষ্ট

চার্লস উইলকিন্সের 'A Grammar of the Sanskrit language' এর ভূমিকার অংশ বিশেষ—

"Mr. Halhead the tanslator of the Gentu Code (the first Englishman, I believe, who attempted to acquire a a grammatical knowledge of it and but for whose example, I myself perhaps, might have shrunk from the task) in his preface to that work, pronounces it to be very copious and nervous, the style of the best authors wonderfully concise and that it far exceeds the Greek and Arabick in the regularity of its etymology. The same author, in the preface to his grammar of the Bengali Language, which was published in 1778, two years subsequently to the Gentu Laws, has the following passage :—"The Grand source of Indian Literature, the parent of almost every dialect from the Persian Gulph to the China seas is the Sanscrit ; a language of the most venerable and unfathom-able antiquity ; which although at present shut up in the liberaries of Brahmans and appropriated solely to the records of their religion appears to have been current over most of the oriental world ; and traces of its original extent may still be discovered in almost every district of Asia. I have been astonished to find similitude of Sancsrit words with those of Latin and Greek ; and these not in technical and metaphysical terms, which the mutation of refined arts and improved manners might have occasionally introduced but in the main ground work of language, in monosyllables in the manners of numbers and the appell-ations of such things as would be first discriminated on the immediate dawn of civilisation.

"In corroboration of these opinions the late sir William Jones the oracle of Oriental learning, in one of his admirable discourses recorded in the Asiatic Researches of the Society instituted by him in Calcutta, has pronounced that —"The Sanscrit Language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure ; more perfect than the Greek. more copious than the Latin and more excellently refined than either."

"The profound and critical knowledge of H.T. Colebrooke Esq. in this language (whose dissertations on various subjects connected with it adorn the pages of Asiatic researches and who himself has published part of a grammar of it renders him above all others competent to pronounce with confidence a judgement on its merits. In the seventh volume of those researches he has given a most admirable essay "on the Sanscrit and Prakrit Languages" which everyone who would acquire accurate information should study ; wherein he declares that former to be—"a most polished tongue which was gradually refined until it became fixed in the classick writings of many elegant poets, most of whom are supposed to have flourished in the century preceding the Christian era It is cultivated by learned Hindus throughout India, as the language of science and literature and as the repository of their law civil and religious."

"Having upon such respectable authorities, shown, that the Sanscrit is highly worthy of the attention of the philologer, to whom the mere structure and affinity of our languages is of the utmost interest, I shall proceed to point out to the learned of a different description, who esteem a foreign idiom in proportion only to its real use, to the

knowledge it may be the means of his acquiring, or the elegant sources of amusement it may contain that in the existing literature of Bharatvarsha (India) they will find an ample reward for the labour of its acquisition. The lover of science, the antiquary, the historian, the moralist, the poet, and the man of taste will obtain in Sanskrit books an inexhaustible fund of information and amusement. Besides the Vedas, there exist at this bay numerous original treatises of considerable antiquity, on astronomy, mathematicks and other sciences, highly worthy of examination ; various system of philosophy and metaphysies ; innumerable tracts on grammar, elocution, logic, the art of peotry, music, medicine, ethics, politics and other topics ; with sublime and elegant poems on every variety of subject ; more particulary those grand mythological treasures, the ancient poems called Puranas an endless assemblage of enchanting allegory and fable and of the most interesting stories of ancient times, recounted in polished numbers, calculated to allure the reader into the paths of religion, honour and virtue.

"About the year 1778 my curiosity was excited by the example of my friend Mr. Halhead, to commence the study of the Sanscrit. I was so fortunate as to find a Pundit of a liberal mind, sufficiently learned to assist me in the pursuit ; but as at that time (and indeed not till very lately) there did not exist in any language I understood, any elementary books, I was compelled to form such for myself as I proceeded, till with the assistance of my master, I was able to make extracts, and at length entire translation of grammars, wholly composed in the idiom

I was studying. I put into English sufficiently intelligible to myself, the greatest part of three very popular grammars, namely the 'Saraswati Prakriyā' of Anubhuti Swarupacharya, the 'Mugdha-bodha' of Vopadeva and the 'Ratnamala' of Purushottama. These extracts and translations I brought with me to England, together with their originals and several other eminent grammars; among which were the celebrated sutras of Panini, the 'Siddhanta Kaumudi' of Bhattoji Dikshita and 'Siddhanta Chandrika' of Ramchandra Sarma with several useful commentaries all of which have been either used or consulted in this compilation."

১৭৮৮ সালের ২৮শে জুলাই কোলব্রুক তাঁর বাবাকে যে চিঠি লেখেন তারই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো :—

"The third volume of the 'Institutes of Ackber' was I believe, sent by Edward. The whole work is a dung-hill, in which a pearl or two lie hid. I have never yet seen any book which can be depended upon for information concerning the real opinions of the Hindus, except Wilkins' Bhagavat Geeta. That gentleman was Sanscrit-mad and has more materials and more general knowledge respecting the Hindus, than any other foreigner ever acquired since the days of Pythagoras.

"You seem to expect that I should say something as to the treatment which the natives of Hindusthan have experienced at the hands of the English. I certainly have been long enough in the country to have formed my opinion, and having not been concerned in a single act of rapacity, that opinion is impartial; but it would take much time to put my ideas into any kind of order; I shall therefore just set down a few desultory thoughts. The conduct of our armies has never been marked with cruelty or rapacity. The fortunes which have been acquired in the military line, have with few exceptions, been acquired at the expense of Government, not at that of the people. The exceptions I allude to, will be explained hereafter and do not relate to the conduct of men in the field. The English have not in the least assimilated with the natives, nor ever carried on social intercourse with them. The cause of this is not so much in the English themselves resident in these countries, as in the regulations of Govern-

ment, which have confined the Europeans to the Presidency, and to the principal factories, where it would be strange if they sought the society of the natives, while a numerous society offered itself of their countrymen, whose manners of course correspond with each individual's habits ; to which those of a native are almost diametrically opposed. Prohibited from acquiring property in land, or even being any ways concerned in its culture, an European can never think of a permanent settlement in the East. He feels himself an alien, a bird of passage, he never can make himself comfortable and secure ; and therefore he looks with an anxious eye, to the moment when he shall have a home, which can only be had in Europe. Why else are so many Europeans content to end their days in America ? Even in the West India Islands ? And why does it never occur in the happier climate of Bengal to fix one's residence for life in the 'Paradise of Regions ?' The religion and manners of the Muhammedans do not assimilate more easily with the diposition and prejudices of Hindus than do those of the English. But Muhammedanism and Christianity are more nearly and easily connected ; and I think I might venture to assert, that if permitted, many Europeans would settle in the internal part of the company's dominions, and in a short period live in habits of familiarity with the neighbouring natives.

Whatever be the cause, the fact is certain and consequences obviuos. Never mixing with natives, an European is ignorant of their real character, which he therefore despises. When they meet it is with fear on one side, and arrogance on the other. Considered as a race of inferior

beings by the appellation of black fellows, their feelings are sported with, and their sufferings meet no more compassion than those of a dog or monkey.

"Contemptuous treatment is, however, the only injury usually received at the hands of their modern conquerors. It has been reserved only for a few chosen spirits to shock their religious prejudices, and to take their property by violence, fraud or any of the modes which rapacity dictates. Nor do I believe that many instances occurred of that kind in this part of Hindusthan, except during the administration of Mr. Hastings. Of the coasts of Coromandel and Malabar I do not pretend to speak ; but in Bengal our wars and public measures, with the exception of the successive depositions of Jaffar Aly and Cossim Aly, seem perfectly justifiable. During the period which followed the acquisition of the Dewany, the nazims were oppressed, the stipendiaries defrauded, the treasures of the Company wasted, but the people were governed by nearly the same rules, and the taxes levied from them upon much the same principles, as under the former Government.

"It was Mr. Hastings who filled the countries with Collectors and judges, who adopted one pursuit—a fortune. Ignorant of the business on which they were employed the members of provincial councils and the Collectors, entrusted the management of affairs to their dewans. These harpies were no sooner let loose upon the country, than they plundered the inhabitants with or without pretences, and, as a price of the sacrifice of every principle of honour, rendered to their employers a small proportion of their ill-gotten pelf. Justice was dealt out to the highest bidders by the judges and thieves paid a regular revenue

to rob with impunity. In this description I would not be understood without exceptions; on the contrary I am induced to hope, that near a third of the servants of the Company employed in such posts, can boast unspotted consciences; but I fear the people have still been oppressed by their servants, though not with their knowledge or for their advantage.

"The matter is now altered; the Revenue servants for the most part understand and perform their duties, justice is impartially administered, crimes repressed, as far as in them lies and the people are not oppressed for private lucre. The collectors and their assistants know how to make a profit without detriment to an individual but even this is not now in practice.

"But it is not alone for the employing Europeans in administering justice and collecting the revenues, that the administration of Mr. Hasting has excited the murmurs of the Hindus. Nor did his crooked politics and shameless breach of faith affect any but the princes and great men; the deposition of Zemindars, the plundering of begums, the extermination of the Rohillas, may be forgotten, but the cruelties, acted in Goruckpore will for ever be quoted to the dishonour of the British name. My pen could not be equal to do justice to my feelings upon this subject. Mr. Burke, no doubt will paint the scenes in glowing colours, and many witnesses are now in England, able and willing to prove the tyranny. But it is not the conduct of individuals that belongs to this question; the system upon which the British dominions have been governed in the East, has more affected the happiness of the people. To regulate nations as an article of trade, for the profit which is to be

derived, seems a solecism in politics; not to mention monopolies of salt and opium or the principles upon which the Company's investment has been provided, I may confine myself to the stretching the land-rents to the utmost sum they can produce. A proprietor of an estate under the Mogul government seldom paid half of his estate, and in small properties much less; he was further allowed to take credit for a certain sum by way of pension or hold rent-free lands in lieu thereof. Under the Company, a landholder is allowed ten percent, of the net produce as his share (if the lands be managed by another person) and this frequently occurs :—an adventurer offers an enhanced rent; his proposals are accepted, he rack-rents the estates, the cultivators emigrate, and he leaves the property reduced perhaps to a third of its value. Sooner than be exposed to this, the landholder will often engage [labourers] on the enhanced rates; but here a less ruin does not await him. Unable to make good his engagements, he falls into the grasp of the extortioner, his property is sold in liquidation of his balance. To elucidate this subject fully would require much time, and might expose me to blame; but I have said enough to justify my conclusion, that although the conduct of the English in Hindustan has been misrepresented, and the crimes of a few exaggerated, and received as a specimen of the characters of the whole, yet the treatment of the people has been such as will make them remember the yoke as the heaviest that ever conquerors put upon the necks of conquered nations."

(৩)

১৮২৯ সালে এসিয়াটিক সোসাইটি সোমা ড করোসীকে পঞ্চাশ টাকা সাহায্যদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সোমাকে সে প্রস্তাবের কথা জানানো হলে তিনি লেখেন ডক্টর উইলসনকে—

"I beg leave to acknowledge the receipt of your letter, together with a draft, dated Calcutta, 15th July 1829 which reached me this day. I feel much obliged to the Asiatic Society for the interest they have been pleased to take with respect to my literary inquiries in Tibet, and for the kind resolution they came to in granting me 50 rupees a month for my support. But since I found their resolution to be of very indefinite character, which leaves me for the future as uncertain as I ever was, since my first study of the Tibetan and since I cannot employ with advantage the offered money during the short period I have still to stay here: I beg to leave for declining to accept the offered allowance and of returning the draft.

"In 1823, in April, when I was in Kashmir, in the beginning of my engagement with the late Mr. Moorcroft, being destitute of books, Mr. Moorcroft, on my behalf, had requested you to send me certain necessary works, I have never received any. I was neglected for six years. Now under such circumstances and prospects, I shall want no books. If not prevented by some unforeseen event, next year I shall be ready with my papers. Then if you please, you shall see what I have done and what I could yet do.

"If the Asiatic Society will then earnestly be desirous to get further information respecting Tibetan literature

both in India and Tibet, I shall be happy to enter into an engagement with them or with the Government on proper terms."

এসিয়াটিক সোসাইটির জেমস্ প্রিন্সেপের কাছে সোমা একটি চিঠি দেন ৩০শে নভেম্বর ১৮৩৫ সালে—ভারতসরকারের কাছ থেকে একটি পাসপোর্ট যোগাড়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্ত ;—

"At my first arrival in British India, though furnished with an introductory letter from late Mr. W. Moorcroft, I was received with some suspicion by the authorities in the Upper Provinces. But afterwards, having given in writing, accordingly as Government desired from me, the history of my past proceedings and a sketch of my future plans, I was not only absolved by Government from every suspicion I was under, and allowed to go to whatever place I liked for the prosecution of my studies, but Government generously granted me also pecuniary aid for the same purpose. Thus during the course of several years, I have enjoyed a favourable oppurtunity of improving in knowledge, especially in the philological part, for my purpose.

"I beg leave, Sir, to offer and express herewith through you, my respectful thanks to the Government and to the Asiatic Society, for their patronage, protection and liberality in granting me every means for my study at their library. But since I have not yet reached my aim, for which I came to the East, I beg you will obtain for me the permission of Government to remain yet for three years in India, for the purpose of improving myself in Sanskrit and in the different dialects ; and if Government will not object to furnish me with a passport in duplicate, one in English

and one in Persian, that I may visit the North-Western parts of India. For my own part I promise that my conduct will not offend the Government in whatever respect, and that I shall not have any correspondence to Europe, but only through you, and that in Latin, which I will send to you, without being closed, whenever I want to write to my own country. I remain with much respect, Sir, your most obliged humble servant.

Calcutta 30th Nov. 1835 A. CSOMA.

এই আবেদন পাঠানোর পনেরো দিনের মধ্যে সোমা পাসপোর্ট পেলেন। পাসপোর্টে লেখা ছিল

"Mr. Alexander Csoma De Koros, a Hungarian Philologer, native of Transylvania, having obtained the permission of the Honourable the Governor General of India in Council to prosecute his studies in oriental languages in Hindustan for three years, I am directed by his honour in council to desire all officers of the British Government, whether civil or military, and to request all chiefs of Hindustan in alliance and amity with the British Government, to afford such protection to Mr. Csoma as may be necessary to facilitate the object of his researches."

ফেলিক্স কেরী বাংলায় 'বিদ্যাহারাবলী' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—তা অনেকটা এনসাইক্লোপিডিয়া জাতের বই। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। বিদ্যাহারাবলীর নিবেদনে তিনি যা বলেছেন তাই তুলে দেওয়া হলো—এর মধ্যে সন্ধানী পাঠক লোকটিকেও খুঁজে পাবেন—

"যে মত অন্য অন্য দেশে মনুষ্যজাতি দুই প্রকার অর্থাৎ মূর্খ এবং জ্ঞানী তদ্রূপ এতদ্দেশেতেও আছে। মূর্খেরা সর্বদা পশুবৎ তাহারদিগের মধ্যে কেহ জ্ঞানাভিলাষী নয় কিন্তু নিতান্ত বিদ্বান যে ব্যক্তি তিনি তদ্রূপ নন তাঁহার চিত্ত অন্যপ্রকার কোন এক বিস্ময় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে কিম্বা কোন একসময় কোন শিল্পকর্ম দেখিলে যাবৎ সে বিষয়ের হেতু কিংবা সে বিদ্যার আদ্যোপান্তকারণ জ্ঞাত না হন তাবৎ তাহার মনে কোন সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক বিদ্বানেরদিগের মন সর্বদা বর্দ্ধিষ্ণু এবং এক বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহাতে ক্ষান্ত নন কিন্তু সর্বদা আরো জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করেন।

পুনশ্চ ঐ বিদ্বানেরদিগের মধ্যে দুইপ্রকার লোক আছেন প্রথমতঃ যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসকরণে আরম্ভমাত্র করিয়াছেন দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা স্বদেশীয় সর্বশাস্ত্রেতে প্রাজ্ঞ হইয়া অন্য অন্য দেশীয় বিদ্যাবিষয়েও জ্ঞাত হওনে অত্যন্তাকাঙ্ক্ষী। এই দুইপ্রকার লোকের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করণে কেবল আরম্ভমাত্র করিয়াছেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে এইক্ষণে কলিকাতায় এবং অন্য অন্য স্থানে সাহেবানেরা এবং অন্য অন্য ভাগ্যবান এতদ্দেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানের মধ্যে বিদ্যাবাহুল্যের জন্যে অনেক অনেক আয়োজন করিতেছেন এবং ঈশ্বরকৃপায় আরো হউক কেননা বিদ্যা সমুদ্রের ন্যায় তাহার অন্ত পাওয়া অতি দুঃসাধ্য।

যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সাহেবান এবং এতদ্দেশীয় অন্ত অন্ত ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোকেরদিগের আয়োজন দ্বারা এবং গ্রন্থ দ্বারা নানা বিভার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানেতে বর্দ্ধিত হইলে অবস্থ তদ্‌গ্রন্থের সমস্ত মূল গ্রন্থ জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন অতএব তাঁহারদিগের জ্ঞান যেন অধিক রূপেতে বর্দ্ধিত হয় এতৎ প্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের গ্রাহ্য তাবদায়ুর্বেদ শিল্পবিদ্যাদি গ্রন্থাবলী ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্তু যাঁহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কি প্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাব কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় সর্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনান্তর অন্ত অন্ত ইউরোপ জাতীয় বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইযাছেন তাঁহারদিগের জ্ঞানবর্দ্ধনার্থে এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদি দেশেতে ইউরোপীয় তাবদায়ুর্বেদ শিল্পবিদ্যাদিবর্দ্ধনার্থে এবং তাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জ্জমা হইয়া ছাপা হইবেক।

এই গ্রন্থের প্রথম নম্বর অন্ত শ্রীবামপুরের ছাপাখানা হইতে নির্গত হইয়াছে এবং যদি এই গ্রন্থ সর্বগ্রাহ্য হয় এবং সকলে যদি এতৎকার্যে সাহায্যকরণাকাঙ্ক্ষী হন তবে ক্রমে যাবৎ এক এক করিয়া তাবদ্বিদ্যা-গ্রন্থ সমাপ্তি না হয় তাবৎ প্রতি মাসে প্রথম দিবসে এক এক নম্বর ছাপা হইবেক। তৎপর যখন এক এক বিদ্যাগ্রন্থ ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ হইবেক তখন সমাচার দেওযা যাইবে তাহাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিযাছেন তাঁহারা প্রতিমাসেব নম্বর একত্র করিয়া বই বাঁধিতে পারিবেন।